ছোটদের পরমাশ্চর্য পত্রিকা। এখন প্রতি মাসেই

জুন ২০১২ □ ১০ টাকা

ছেলেবেলা





পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ফিরে এল বাংলা পত্রিকার সোনালি যুগ

কালের
কষ্টিপাথর

বাংলার নতুন পাক্ষিক ■ বাঙালি মননে নবতরঙ্গ





প্রথম সংখ্যায়

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা সময়ের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য
একাত্তরের দিনগুলি জাহানারা ইমাম
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শক্তি-শরৎ-সন্দীপন
প্রমুখ বহু বিশিষ্ট কবি-লেখকের চিঠি
অমিতাভ চৌধুরীর **মহাজনসঙ্গ** মুজিবরের মুখোমুখি
বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের **যে কথা বলা হয়নি**
সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক **গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি**
আমাদের নাট্যচর্চা বিভাস চক্রবর্তীর ধারাবাহিক
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ধারাবাহিক উপন্যাস **বিষাদগাথা**
রমানাথ রায়ের **স্বনির্বাচিত তিনটি গল্প** // মোঙ্গোলিয়ার **কবিতাগুচ্ছ**
উপেন্দ্রকিশোর সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ **প্রসাদরঞ্জন রায়**
চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকায় লেখায় **চণ্ডীমণ্ডপ** ● **আমলাশাহী** তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদপত্রে **একালের কথা** ● সাময়িকপত্রে **সেকালের লেখা**
● খোলা খাতা ● বই-ঠেক ● কবিতার কথা









আরও অনেক লেখা, আরও অনেক বিস্ময়

এই সংখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
কিংবদন্তিতুল্য দুই কবি-সাহিত্যিকের স্বকণ্ঠে
গল্প ও কবিতাপাঠের অমূল্য ভিসিডি

ঘরে বসে ক্যুরিয়ার-খরচ ছাড়াই ক্যুরিয়ারে পত্রিকা পাবেন

একবছরের ২৪টি সংখ্যার জন্য ৭০০ টাকা পাঠালে আমাদের খরচে ক্যুরিয়ারে
আপনার ঠিকানায় নিয়মিত পত্রিকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় টাকা পাঠাবেন।
নিজের পুরো নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর ছাড়াও অনুগ্রহ করে "কালের কষ্টিপাথর/গ্রাহক মূল্য" লিখে দেবেন।
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ঘরে বসে ভিসিডি সহ শুধু প্রথম সংখ্যাটিও নিতে পারেন।
সেক্ষেত্রে ৩০ টাকা ১০ জুনের মধ্যে ওপরের ঠিকানায় পৌঁছনো চাই।

গ্রাহকমূল্য অনলাইনেও পাঠাতে পারেন
www.swarnakshar.in

ঘরে বসে ক্যুরিয়ারে

ইন্টারনেটেও টাকা পাঠাতে পারেন

অনলাইন গ্রাহক হোন www.swarnakshar.in

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ছেলেবেলা

এখন ইন্টারনেটেও: www.echhelebela.com

প্রথম বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা। জুন ২০১২। আষাঢ় ১৪১৯



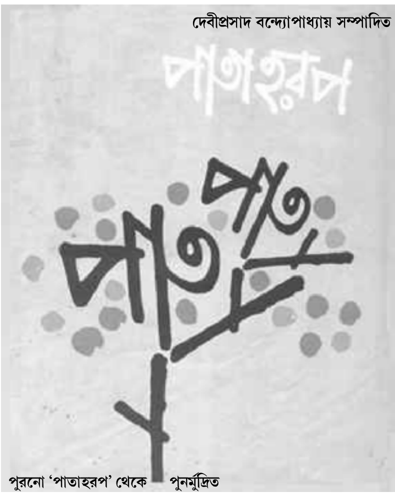


















প্রচ্ছদ: ছবি শান্তনু দে

ছেলেবেলা
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail : chhelebela@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in
Editor's Website: www.amarendrachakravorty.com

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ (মুদ্রণ বিভাগ), কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফেজ-২, প্লট-১৬, কলকাতা-১০৭ থেকে তাঁর দ্বারা মুদ্রিত।
সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী **যুগ্ম সম্পাদক** : মৈত্রেয়ী নাগ

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। দাম ২০ টাকা



'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

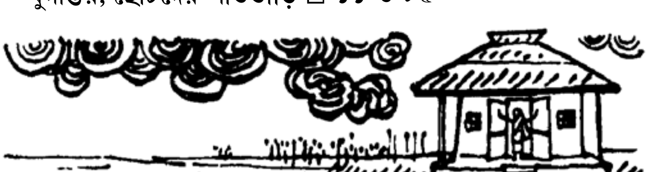


একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫



বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮



সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের



কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

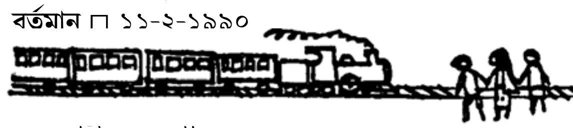
একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮



কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০



অনলাইনেও পাবেন

www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।


হীরু ডাকাত

সম্পাদকের কথা

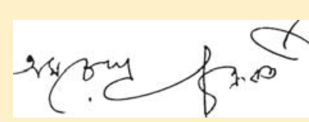


'ছেলেবেলা' অসংখ্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে জেনে আমারও হৃদয় ময়ূরের মতো নাচে। কোন এক দেশে ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতি ধেয়ে আসছে দেখেছিলাম, পাঠকের চিঠিও আসছে সেইরকম, ঝাঁকে ঝাঁকে। একবার আমাজনের জঙ্গলে নদীজলের ওপর কাঠের ঘরের খোলা বারান্দায় সারা রাত অসীম রহস্যঢাকা জঙ্গলের অদ্ভুত আশ্চর্য সব কীটপতঙ্গের আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে দেখি আমার সারা গায়ে, মুখে, মাথায়, চুলে, কানের ভেতরে, জামা-প্যান্ট ছেয়ে হাজার হাজার পোকামাকড় বসে আছে। মে-মাসের 'ছেলেবেলা' বেরবার পর থেকে চিঠিও আসছে সেইরকম, পড়তে পড়তে বেলা কাবার। আনন্দে অপেক্ষা করে আছি কবে 'ছেলেবেলা' পড়ে আন্টার্কটিকার বরফদ্বীপ ড্যাঙ্কোয় বাসা বাঁধতে আসা দশ হাজার পেঙ্গুইনের মতো এক মাসে দশ হাজার চিঠি উড়ে আসবে।

অনেক চিঠিতেই দেখি, বড়রা জানতে চান— 'ছেলেবেলা'র ভাব-ভাবনা বা পরিকল্পনা আমার মনে এল কী করে। কেন, আমার ছেলেবেলা থেকে! তার সঙ্গে বড়বেলায় অচিন দেশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর পাঠশালায় নিত্যনতুন হাতেখড়ি নিতে নিতে। দেশ-দেশান্তরে সেইসব ঘুরে বেড়ানোর সময় হয়তো মনে মনে তুলে রেখেছি মায়ানমারে মহিষের পিঠে ছোট্ট রাজকুমার বা চিনদেশের বিশাল ঘুড়ি বা আফ্রিকার আকাশছোঁয়া জিরাফ কি ঘাসভূমি আলো করা জেব্রার পাল, চিতা বা সিংহীদল। তাছাড়া আমার ছেলেবেলা তো শুধুই আমারই ছেলেবেলা নয়, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন— এখন যতই তাঁরা দাদু-দিদা হোন— সকলের ছেলেবেলার আনন্দ মিলেই আমাদের এই 'ছেলেবেলা'। সেইজন্যই এখনকার ছোটরাও তাদের নতুন যুগের নানান ধুম-ধামাকায় হারাতে বসা ছেলেবেলার চিরনতুন আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে 'ছেলেবেলা'র লেখায়-ছবিতে।



আমাদের দায়িত্ব 'ছেলেবেলা'কে আরও সুন্দর আরও আনন্দের করে তোলা।



পাঠকদের মধ্যে যাঁরা 'ছেলেবেলা'য় লেখা পাঠাচ্ছেন, তাঁদের জানাই, অনুগ্রহ করে লেখার সঙ্গে রিপ্লাই কার্ড দেবেন না। লেখা সবসময় মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে। এই মর্মে লেখার শেষে একটি ঘোষণাও থাকা চাই। লেখা মনোনীত হলে লেখা পাবার তিন মাসের মধ্যে তা ছাপাবার চেষ্টা করা হয়। ছাপা হতে আরও দেরি হলে কেবল সেক্ষেত্রে লেখককে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না। লেখা পাঠাবেন কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় বা টাইপ করে। সঙ্গে অবশ্যই নিজের নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।

—সম্পাদকীয় বিভাগ



সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০



সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

চণ্ডীতলার কৌতুক

শাড়ির মধ্যে ঘড়ি বাজল

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী



কাজের লোক বলে তার ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে না, মুখ্যু হয়ে থাকবে এমন তো হতে পারে না। সেজন্য ছোটকাকু দিলেন বাড়ির কাজের লোক মন্টুর মা-র বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করে। নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। মন্টুর মা-র ছেলে তো স্কুলে ভর্তি হল। মাস খানেকের মধ্যে ছোটকাকু সাধের পেনটা হারাল। অনেক খুঁজেও মিলল না। মন্টুর মা-কে শুধোতেই জবাব এল— বোধহয় কাকে নিয়ে গেছে। চৈত্র মাসে কাকে বাসা বাধে। জানলা খোলা রাখবেন না।

মাস খানেকের মধ্যেই আবার দুর্ঘটনা। টেবিলে রাখা এলার্ম ঘড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না। সকালেও ছিল। কাকা কোর্টে যাবেন। নটায় এলার্ম বাজলেই তিনি স্নানে যান।

মন্টুর মা-র জবাব— ঘড়ি! তাতো জানিনে। জানলাটা বন্ধ রাখলেই পারেন। জানলা খোলা থাকলে, আঁকশি দিয়ে জামাকাপড় সবই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জানলাটা বন্ধ রাখুন।

মন্টুর মা-র কথা শেষ হতেই এলার্ম বেজে উঠল তার শাড়ির মধ্য থেকে।

চিল মা

মূল কাহিনী: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি **ছড়ায় রূপান্তর:** শুভজিৎ বরকন্দাজ

বন্ধু যারা গল্পলোভী, গল্প ভালোবাসো
আজ তোমাদের দারুণ-ই এক গল্প শোনাই এসো।
এ গল্প এক মাকে নিয়ে, এ গল্প রূপকথার
এ গল্পতে সুখ রয়েছে, দুখ্ রয়েছে ব্যথার।
ফুল ফুটেছে দুঃখ সুখের কোথায় কত কার
শোনাই শোনো সেই কাহিনী; এক খুকু আর মার।

মা আমাদের সবার আপন, মা এনেছেন আলোয়
মায়ের কাছে তফাৎ কী হয় মন্দ সাদা-কালোয়!
মা শুধু নন মানুষকুলের, মা আছে গো সবার
জন্তু জীবে পাখ-পাখালি, ভাঁট-পিটুলি জবার।
সবাই তারা এক একরকম আদত আদল বাহার
তবু কত মিল রয়েছে ভালোবাসায় তাহার।

তেমনই এক মায়ের কথা আজ তোমাদের বলি
এই মা থাকে দূর আকাশে, জঙ্গলে শাল্মলীর
বৃক্ষশাখায় ছোট্ট বাসায়, হালকা অলস ডানায়
খায় খুঁটে খায় উপছানো সুখ মেঘের কানায় কানায়।
ঠিক ধরেছ বলছি তো এক চিল পাখিটির কথা
এবার শোনো কেমন সে মা, কোথায় তাহার ব্যথা।

দূর দেশের এক শহরতলির বড় ঘরের বউ
কাটছিল সে কুটনো একা, আর ছিল না কেউ।
তার ছিল এক ছোট্ট খুকি ভীষণই টুকটুকে
একলা পেয়ে চিল পাখি এক তুললো তারে মুখে।
হুস করে সে চলল উড়ে আকাশ পথে ভেসে
টের পেলনা কিচ্ছুটি কেউ, করল চুরি, কে সে।



শহর ফেলে গঞ্জ ফেলে সাগর ফেলে বন
সেইখানে চিল বৃক্ষশাখায় রাখলো চুরির ধন।

এ সংসারে আপন বলে কেউ ছিল না তার
আজকে সে তাই ছিনিয়ে নিল বুকের ধন এক মার।
খুকির তবু দারুণ খুশি, চিল-মা ভীষণ ভালো
হাসিতে তার জ্যোৎস্না ঝরে, হাসিতে তার আলো।
দেশ বিদেশের খেলনা এনে চিল-মা দিত তাকে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বিষ্টি বাদল ডানায় ঢেকে রাখে।
এমনি করেই দিন কেটে যায় বছর আসে ঘুরে
চিলের বাসায় চরকা ঘোরে খুকির গানের সুরে
বন মজে যায় ঘুমায় জাগে বনের পশু পাখি
চিল-মা দেখে দু'চোখ ভরে, সিক্ত তাহার আঁখি।

একদিন সেই দেশের রাজার শিকারে শখ হ'লো
এলেন তিনি বনের ভেতর, তাঁর সাথীরাও এলো।
হঠাৎ সবাই চমকে গিয়ে শুনলো আজব স্বর
চিলের বাসায় কী করে হয় চরকারই ঘরঘর!
রাজামশাই হুকুম দিলেন, এক্ষুনি যাও দ্যাখো
চিলের আঁচড় কামড় থেকে বাঁচলো না কেউ একও।
শেষটা রাজা নিজেই এলেন, অবাক হলেন তিনি
চিলের বাসায় চরকা ঘোরায় এ কোন সৌদামিনী!
মুগ্ধ রাজা খুকির রূপে, করব একেই রানী
ছজন ঘরে তবুও তার গ্রহণ করেন পানি।

চলল বাজন, আনন্দগীত আলোরই রোশনাই
সবাই দেখে মুগ্ধ রানী— তার কোনো দোষ নাই।



কিন্তু রাজার ছয় রানী যে, মন ভালো নয় তাদের
হিংসুটি, আর ছক কষে এক জবর অপবাদের।
রাজার কানে লাগান ভাঙ্গান ছোট্ট রানীর নামে
না চেনে বাপ না চেনে মা; এমনই বদনামে।
মন ভরে যায় দেখলে রাজার ছোট্ট রানীর মুখ-ই
বলেন, আহা দোষ নিও না, ও যে চির দুঃখী।
এমনি করেই দিন কেটে যায় রাজাও সুখে থাকেন
হঠাৎ সেদিন কোন খেয়ালে সাত রানীকেই ডাকেন

আসলো সবাই রাজার ঘরে বলেন রাজা, শোনো
খুব করে ঘর সাজাও দেখি চোখ ভরে যায়, মনও
ছয় রানী তো দারুণ খুশি, এই তো সুযোগ এলো
বনকাপাশী, মুখ্যু রানী, ঘর সাজাবি কি লো!
সবাই জবর উৎসাহে আর দারুণ আড়ম্বরে
পর্দা ঝালর সোনায় রূপোয় ভরিয়ে দিল ঘরে।
একলা তখন ছোট্ট রানী গভীর মনের ব্যথায়
বৃক্ষতলে অশ্রু ঝরায়, আকাশ ভাঙে মাথায়।

কেমন করে ঘর সাজাবে তার কিছু নেই জানা
কই গেলি মা একটিবার আয়, ওই যে দূরে ডানা
ঝাপটালো কে? কে আসে গো, ওই তো গো সেই চিল
ছোট্ট রানীর মুখখানি তাই আনন্দে ঝিলমিল।

চিল-মা এসে মেয়ের মুখে সব শুনে কয়, এই-ই?
দিচ্ছি করে সব সমাধান ভাবনা কিছুই নেই।
এই না বলে কোথার থেকে আনলো মা এক পাতা
পাতা তো নয়, সেই তো রানীর একলা পরিত্রাতা।
মায়ের কথায় ছোট্ট রানী সেই পাতাটি ঘরে
ঝুলিয়ে দিল দরজা, দেওয়াল জানলাগুলির পরে।
মুহূর্তে সব ম্যাজিক যেন, সবটা হল সোনা—
বলেন রাজা যা দেখেছি জীবনে ভুলবোনা।

কদিন পরেই রাজামশাই আবার ডাকেন, রানী
পরখ করতে চাই তোমাদের হাতের রান্নাখানি।
ছয় রানী তো উছলে ওঠেন রাজার এ প্রস্তাবে
ছোট্ট রানী রাঁধবে যা তা ওই রাজা কী খাবে!
দিনের দিনে উৎসাহে খুব রাঁধলো দারুণ ছ'জন
খেলেন রাজা, সাবাস দিলেন— মনের মতন ভোজন।
এদিকে সেই ছোট্টরানী আবারও চিল মাকে
ডাকলো এসে, দুখের কথা বলল খুলে তাকে।
চিল শুনে কয়, ভাবনা কী মা এই দিলাম এক হাঁড়ি—
কিচ্ছুতে তোর কম যাবে না, পোলাও বা তরকারী।

বলব কী গো আজ তোমাদের সেই হাঁড়িরই গুণে
লক্ষ লোকের ভোজন হল অবাক হবে শুনে।
পোলাও ছিল, মন্ডা মিঠাই অপূর্ব সব খাবার
হাতের কাছে বুঝতে পেলে, চাইতে ফিরে আবার।
রাজাও তেমন জমিয়ে খেলেন, খেলেন চেটে পুটে
ছোট্ট সাধের রানীটি তাঁর মন নিয়েছে লুটে।

কিন্তু বাকি ছয়জনা তাঁর, ভীষণ রকম রাগে
ফুঁসছে তখন ভাবছে ওকে কখন পাবে বাগে।
ছোট্ট রানী রাক্ষুসী তুই বাড় বেড়েছিস বড়ো
চিবিয়ে তোকে করব চিঁড়ে একটু সবুর করো।
সত্যি গো সেই দিন ভয়ানক এসেই গেল কাছে
সাত রানী যায় নদীর ঘাটে, গল্প অনেক আছে।
স্নান করাবার ছল করে সেই হিংসুটে ছয় রানী
ধরল চেপে ছোট্ট রানীর নরম ও হাতখানি।
তারপরে তায় ধাক্কা মেরে ফেললো নদীর জলে
রাজার কাছে খবর গেল ডুবলো রানী— ব'লে।
গভীর বিষাদ; মনখারাপে আহার ছাড়েন রাজন
আর ওদিকে নৃত্য করেন উল্লাসিনী ছ'জন।
ভাবছো কি গো সত্যিকারেই ডুবলো ছোটো রানী?
ডুববে কী গো, চিল-মা তাকে আনলো বাসায় টানি।

ঘরের মেয়ে ফিরলো ঘরে মায়ের চোখে জল
মুক্তোদানার মতোই করছিল টলমল।
আবার বনে জোয়ার এল আনন্দ আর সুখের
চিল-মা তোমার উষ্ণ ডানায় দিন ভুলে যাই দুখের।
হয়ত এমনভাবেই কেটে পেরিয়ে যেত দিন
কিন্তু বিধি কার কপালে কী লেখে রঙিন!
রাজাও আবার এলেন বনে পড়ল নজর তাঁর,
চমকে গেলেন ভীষণরকম এ কী চমৎকার!
বেঁচেই আছেন ছোট্ট রানী— এমন কী সম্ভব?
শীঘ্র তিনি ব্যাপারখানি বুঝতে পারেন সব।
ফেরেন রাজা লক্ষ্মী নিয়ে, রাজ্য জুড়ে ধুম্
জানতে পেরে ছয়টি রানীর উড়লো চোখের ঘুম।
ভীষণ ক্রোধে রাজন এবার দিলেন তাদের সাজা
ঘোল ঢেলে দে, মুড়িয়ে মাথা, বাজনা সবাই বাজা।
তারপরে ওই রাক্ষুসীদের দে করে দে দূর
মনের মানুষ পেয়েই রাজন খুশীতে ভরপুর।

সত্যি গো সেই রাজ্য জুড়ে আনন্দ উছলালো
রাজার খুশি প্রজার খুশি চিল-মাও চমকালো।

ছবি: শান্তনু দে



বরফের বাগান

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আগের কথা

জমাট বরফের দেশ আন্টার্কটিকা যাওয়ার জাহাজে দেখা হয়ে গেল আমার পূর্বপরিচিত কোনও এক দেশের রাজার সঙ্গে। এর মধ্যে জাহাজ ড্রেক প্যাসেজের ভয়ংকর দুর্বিপাকে পড়েছে। তুষারপাতের মধ্যেই হাফমুন আইল্যান্ড নামে শত শত পেঙ্গুইনের বাসস্থানে নোঙর করেছে। তারপর আবার মাইলের পর মাইল-ব্যাপী কঠিন বরফের হিমশৈলগুলির পাশ কাটিয়ে চলেছে। হঠাৎই একদিন ঝড়ের তাণ্ডবে হিমবাহের পনেরো-কুড়ি মাইল দীর্ঘ একটি অংশ ভেঙে জাহাজের গায়ে পড়ায় জাহাজ পথভ্রষ্ট হল, রাডার কাজ করছে না। পথ হারিয়ে জাহাজ পৌঁছল এক অজানা দ্বীপে। দ্বীপ জুড়ে বরফের স্তূপ আর অসংখ্য নানা আকারের নীল টলটলে জলের হ্রদ। ধেয়ে এল মারাত্মক তুষারঝড়। রাজার সঙ্গে থাকা আফ্রিকার জঙ্গলের এক মৃতসঞ্জীবনী গাছের সুগন্ধে কোনওমতে প্রাণ বাঁচল এ যাত্রায়। প্রায় হাঁটুসমান বরফ ভেঙে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, দাঁড়িয়ে আছি এক বড় ফাটলের সামনে। ফাটলের ভেতর থেকে উঠে আসছে অদ্ভুত তীব্র নীল আলো। রাজা বললেন, তিনি ফাটলের ডানদিক ধরে এগোবেন। যদি ফিরে না আসেন তাহলে যেন তার পদচিহ্ন লক্ষ করে আমিও সেদিকে এগিয়ে যাই। কুমেরুবৃত্তের ঠিক কোথায় এ জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না। দূরে সহসা অসংখ্য পেঙ্গুইনের গলা শুনে মনে আশা জাগল, সমুদ্র হয়তো কাছেই। তা যদি হয়, তাহলে আমাদের এই ভয়ংকর তুষারক্ষেত্র থেকে উদ্ধার পাওয়ারও একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকবে। এদিকে রাজা ফিরছেন না দেখে আমি তার পদচিহ্ন লক্ষ করে এগোতে থাকি। ডাইনে-বাঁয়ে আকাশছোঁয়া ও বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণি। ঠান্ডা ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে। সামনের বরফপ্রাচীরের বাঁদিকের অংশে দেখি একটা মস্ত তোরণ। সেখানেও নীল আলোর ছটা। তোরণের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন রাজা। তাঁকে অনুসরণ করি। তোরণের মধ্যে দিয়ে সুদীর্ঘ গুহা চলে গিয়েছে। গুহাপথের বাঁদিকে ছোট-বড় আরও অনেক গুহা। প্রত্যেক গুহামুখ নীল আলোর আভায় ঢাকা আর সেখান থেকে উষ্ণ হাওয়া বেরচ্ছে। হঠাৎ রাজা ডাকলেন। তাঁর কথামতো বরফে কান পেতে শুনি টুংটাং বাজনার মতো এক আশ্চর্য সংগীত। এই অদ্ভুত ধ্বনি আর রহস্যময় নীল আলোর উৎস কী? রাজা আবার আমায় অপেক্ষা করতে বলে গুহার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

১০

সুদীর্ঘ বিরাট গুহাটার ভেতরে যেমন, এই গুহাতেও তেমনই, যতদূর চোখ যায়, নীল আলো। বড় গুহার চেয়ে এ-গুহার ভেতরটাও আরও বেশি উষ্ণ। তবে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাওয়া উচিত কিনা জানি না। কোথাও কোনও বিপদ লুকিয়ে আছে কি না, কে বলবে! রাজার আদেশ মেনে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই।

গুহার বাইরে এতক্ষণে বোধহয় অল্প সময়ের জন্য সূর্য অস্ত গিয়ে আবার উদিত হচ্ছে।

রহস্যময় সংগীতের রোমাঞ্চকর আকর্ষণে আমিই সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। সামনেই বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে নীল আলো হঠাৎ যেন ঢেউ তুলতে লাগল। কাছে গিয়ে দেখি, সামনে, অল্পদূরে নিখুঁত চৌকো করে কাটা বড় বড় বরফের চাঁই একটার সঙ্গে একটা অদ্ভুতভাবে জোড়া লাগানো। অনেকটা আমাদের দেশের রাজমিস্ত্রির ইট বা পাথরখণ্ডের গাঁথনির মতো। একেকটা বরফের চাঁই ওপরে-নীচে ও পাশাপাশি দশ-পনেরো ফুটের কম না। সামনে থেকে পিছন অব্দিও সমান মাপের। একেকটা চাঁইয়ের মোট আয়তন অন্তত ১,২২৮ ঘন ফুট, হয়তো আরও বেশি। প্রত্যেকটা জোড় থেকে তীব্র নীলাভ আলো বেরিয়ে অবিরাম নীল ঢেউ সৃষ্টি করে চলেছে।

নীলাভ বরফের ওপর লাল রক্ত দেখে আমার হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে উঠে এল। রক্তের পাশেই রাজা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। কাছে গিয়ে দেখি রাজার নিশ্বাস পড়ছে, কিন্তু শরীরে কোনও সাড় নেই। দেহটা চিৎ করে বরফের ওপর জমাট বাঁধা রক্তের উৎসও স্পষ্ট হল। নাক ও ঠোঁটের কোনা দিয়ে বেরিয়ে চিবুক গলা বেয়ে রক্তের ধারা অনেকটাই শুকিয়ে গেলেও তখনও ক্ষীণ ভাবে বয়ে চলেছে।

ভয়ানক বিপদে সম্পূর্ণ সহায়হীন অবস্থায়, প্রাণপণে চিৎকার করেও যখন কোথাও কোনও সাহায্যের কোনওই সম্ভাবনা নেই, মানুষের মন তখন কী ভাবে কী করবে আগে থেকে কারওই জানা থাকে না। আমি তাঁরই পার্কার পকেট থেকে সঞ্জীবনী সুগন্ধির শিশি বের করে ছিপি খুলে তাঁর নাকের কাছে ধরে রইলাম। ঠোঁট ফাঁক করে গোমুখের সাধুর ওষুধটাও ছ-সাত ফোঁটা জিভে ফেললাম।

এভাবেই নাকে ও ঠোঁটে বার কতক ওষুধ দেবার পর রাজা একসময় চোখ মেললেন। তারপর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমার সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়ে ধীর স্বরে বললেন, 'তুমি যে আমাকে খুঁজে পেলে সেটা আমার জীবনের একটা খুব বড় পাওয়া।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন, 'জাহাজে দেখে সন্দেহ হয়েছিল, এত দূরে চলে আসবে ভাবিনি। আমার যন্ত্রটা শুধু নয়, এই অসীম তুষারক্ষেত্রের ম্যাপটাও নিয়ে গেছে।'

সুরেলা বাজনা এবার আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মনে হয় দূরে কোথাও অনেকগুলো ঝাড়বাতির টুংটাং আওয়াজ আশ্চর্য সুরে বেজে চলেছে। আওয়াজটা ভারি মধুর, সেই আওয়াজের বুনুনিতে যে সুর সৃষ্টি হচ্ছে তা মনকে অদ্ভুত আবেশে আচ্ছন্ন



করে দেয়। ব্যাটারি হয়তো আরও পনেরো-কুড়ি সেকেন্ড চলবে, ক্যাসেটেও আরও তিন মিনিট আছেই, তাছাড়া এই প্রথম এই অলৌকিক সংগীত এত স্পষ্ট শুনছি যে আমার সামান্য হাত-ক্যামেরায়ও রেকর্ড করা যায়, তা সত্ত্বেও ক্যামেরা চালাবার উৎসাহই পেলাম না। সব এক্সপোজড ক্যাসেটই জাহাজে রয়ে গেছে! জাহাজ থেকে দ্বীপে নামবার সময় প্রতিবারের মতো কেবিনেই রেখে এসেছি। একটা ফুল চার্জ করা সাত ঘণ্টার ব্যাটারিও কেবিনে রয়ে গেছে! সর্বনাশ, এরপর তাহলে আর ছবি তোলাই যাবে না! যখনই মনে পড়ে, তখনই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আন্টার্কটিকার রোমাঞ্চকর সব দৃশ্যভরা পুরো সাতটা ক্যাসেট জাহাজে রয়ে গেল!

রাজা আরেকটু সুস্থ হলে যন্ত্র ছাড়াই আমাদের গুহা অভিযান আবার শুরু হল। ভোরের দিকে এক জায়গায় রাজা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা!'

ভীষণ চমকে গিয়ে দেখি রাজা মাথার ওপর দুহাত ছড়িয়ে অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচাচ্ছেন। গুহার মধ্যে তাঁর ওই উচ্চস্বর গমগম করতে লাগল।

কাছে যেতেই রাজা দুহাতের তালু দিয়ে বিশেষ একটা বরফের চাঁই ঠেলতেই সেই চৌকো বরফ ছ-সাত ফুট পিছনে সরে গেল। আমাদের সামনেই তখন একটা চৌকো কুলুঙ্গির মতো খাঁজ তৈরি হয়েছে। রাজা সন্তর্পণে সেই কুলুঙ্গির মতো ফাঁকা জায়গাটায় উঠে পড়লেন। আমাকেও হাত ধরে টেনে তুললেন।

এ যেন একটা বরফের ঘর— পাথরে তৈরি ঘরের মতোই, শুধু পাথরের জায়গায় জমাট বরফের চাঁই। গুহার মধ্যে শীতের যন্ত্রণাদায়ক কামড় এমনিতেই অনেকটা নিস্তেজ, এই বরফের চৌখুপিতে সেই তাপমাত্রা রীতিমতো আরামদায়ক। মাথার মাঙ্কি ক্যাপ ও হাতের চামড়ার দস্তানা খুলে পার্কা-র পকেটে তো ঢোকাতেই হল, পার্কা-র জিপারও গলার কাছ থেকে অনেকটাই খুলে ফেললাম।

বরফের চৌখুপিতে উঠে আসবার পর থেকেই শরীরে খুব মৃদু একটা দুলুনি টের পাচ্ছি। পুরো গুহাটা অথবা হয়তো এই বরফপ্রাচীর বা এই চৌখুপিতে আমাদের পায়ের তলার বরফের চাঁইটা খুব ধীরে ধীরে কি আমাদের বাঁদিক থেকে ডানদিকে এগিয়ে যাচ্ছে? এ যেন অনেকটা হিমশৈলের মতো, তবে প্রায় অদৃশ্য গতিতে, শুধু অনুভব করা যায়! মৃদু ভূমিকম্পে যেমন মাথাটা প্রায় অজ্ঞাতে দুলে ওঠে, আমার সেইরকমের অনুভূতি হচ্ছে। এই পাহাড়, এই বড় গুহা, এই গুহার মধ্যে শাখাগুহা— এ-সবই একটা বিরাট হিমশৈল নয় তো? নাকি এক বিশাল হিমবাহ? বিপুলায়তন অস্থির কোনও বরফখণ্ড হওয়াও কি সম্ভব?

রাজার দুই চোখ এখানেও যেন কোনও কিছুর ধ্যান করছে। ওই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি একইভাবে সামনের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী সুরেলা ধ্বনি! কী আশ্চর্য সংগীত! মন দিয়ে শোনো। যেন নতুন কোনও কথা বলছে।'

হঠাৎই ওই অপরূপ সংগীত আগের চেয়ে জোরালো হয়ে উঠল! আরও অবাক ব্যাপার, পায়ের তলার বরফের চৌকো খণ্ডটা তার বাঁদিকে সাঁটা বরফখণ্ড থেকে অন্তত দু-ইঞ্চি সরে এসেছে! দুই বরফখণ্ডের জোড়ার দাগ থেকে যে নীল আলো বেরচ্ছিল সেটাও এখন আরও বেড়ে গেল।

রাজা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এক লাফে জোড়ের মুখে গিয়ে নতুন বড় ফাঁকটার ভেতরে তীব্র চোখে তাকিয়ে রইলেন। বরফের চাঁই নিজে থেকেই সরে গিয়ে, দু-আড়াই ফুট চওড়া একটা গর্ত তৈরি হল। গর্তের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে উবু হয়ে বসে খুব সতর্কভাবে রাজা নীচে লাফিয়ে পড়লেন। আমার উদ্দেশে অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'নির্ভয়ে নেমে এসো। লাফাও, এখানে পূর্ণ জ্যোৎস্না, অপার আনন্দসংগীত!'

নীচে নেমেই মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো! এরকম কিছু পৃথিবীতে আছে নাকি? এই কি স্বর্গ? নাকি এ পাতালরাজ্য? এ কি আমাদের পৃথিবীর কোনও অজানা দেশ? গত কয়েকদিনের সব বিস্ময় আমার ছাপিয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পৃথিবী!

আমাদের সামনেই জমাট বরফের সিঁড়ি খাড়া নেমে গেছে। এর শেষ কোথায়? কী আছে এই সিঁড়ির শেষে?

সামনে রাজা, পিছনে আমি, তীব্র কৌতূহলে নেমে চললাম। সিঁড়ির শেষে আবার একটা দীর্ঘ গুহা, তবে এটা একটা ঢাকা করিডরের মতো, ছাদ দেওয়াল মেঝে সব জমাট বরফের। পুরোটাই নীল আভায় ভরা। সংগীত এখানে আরও স্পষ্ট। হাজার হাজার কাচের ফাঁপা নল হাওয়ায় দোল খেতে থাকলে, পরস্পরের ঠোকাঠুকিতে যেরকম টুংটাং শব্দলহরী শোনা যায়, এই আওয়াজ অনেকটাই তেমনই, কিন্তু টুংটাং ধ্বনিতে এক অপূর্ব সুরের মায়াজাল সৃষ্টি হয়েই চলেছে।

করিডর পেরিয়ে এসে দেখি সামনেই বিরাট বাগান। সারি সারি বরফের গাছ, গাছের ডালপালা থেকে ঝুলছে কাচের মতো সরু সরু পাতলা বরফের ফালি, তার সুরে-ধ্বনিতে আর নীল আলোর মায়ায় পুরো জায়গাটাই যেন এক জাদুরাজ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার— শুধু করিডর ও ঘরবাড়িই বিরাট বিরাট চৌকো বরফের চাঁই দিয়ে তৈরি না, বাগান, গাছ, গাছের ডালপালা এমনকি গাছের পাতাও বরফের!

ছবিঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত *এরপর আগামী সংখ্যায়*



বিলিতি ছড়া

অশোক চক্রবর্তী

১

ঝিকমিক ঝিকমিক ছোট্ট তারা,
তুমি যে কী তা ভেবে হচ্ছি সারা—
পৃথিবীর থেকে ওই অত ওপরে
আকাশের বুকে যেন টুকরো হিরে।

ঝলমলে সূর্য অস্তে গেলে
কিছুরই ওপর আর আলো না ফেলে,
তোমার ছোট্ট আলো ফোটাও তখন
ঝিকমিক ঝিকমিক নিশীথযাপন!

তখন অন্ধকারে পথচারীরা
তোমাকে ধন্যবাদ দেয় অবিরাম—
কোন পথে যেতে হবে জানত না যে
ঝিকিমিকি আলো তার লাগল কাজে।

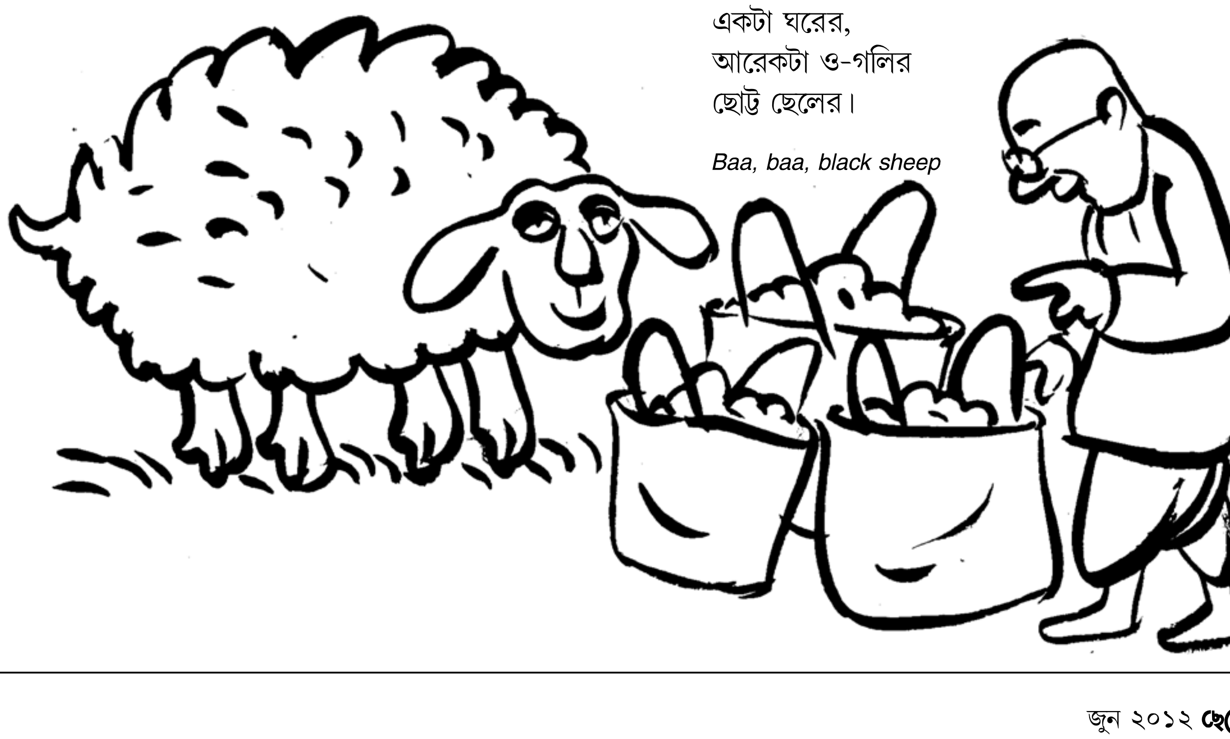
Twinkle, twinkle, little star



২

ব্যা ব্যা কালো ভেড়া
উল আছে কি?
হ্যাঁ মশাই তিন ব্যাগ
ভরে রেখেছি—
একটা তো মনিবের,
একটা ঘরের,
আরেকটা ও-গলির
ছোট্ট ছেলের।

Baa, baa, black sheep





৩

এক দুই তিন চার পাঁচ
ধরেছিলাম একখানা মাছ।
ছয় সাত আট নয় দশ
তারপরই ছেড়ে দিই ফস।
কেন ছেড়ে দিলে বলো ভাই?
আঙুলে কামড়েছে তাই।
দেখি কামড়াল কোনটাতে?
কড়ে আঙুলে ডানহাতে।

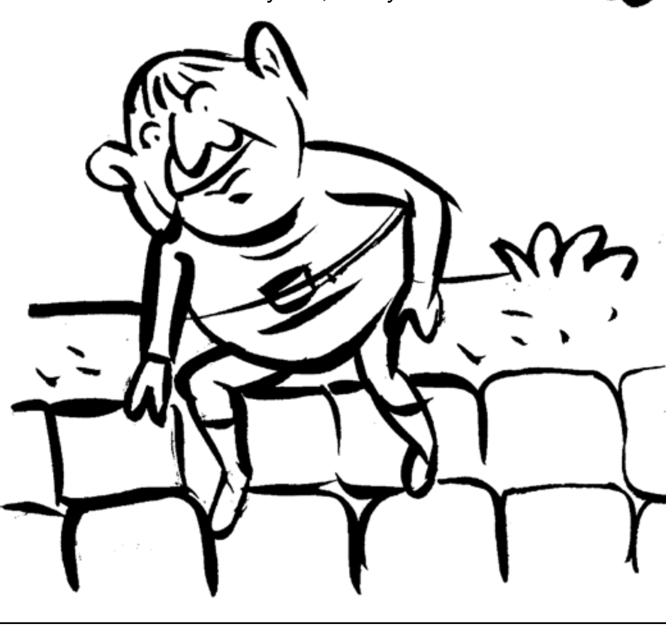
One, two, three, four, five



৪

ম্যাও পুষি, ম্যাও পুষি,
কোথায় ছিলে?
গেছিলাম লন্ডনে
রানি দেখতে।
ম্যাও পুষি, ম্যাও পুষি,
কী কাজ সেথায়?
চেয়ারের তলা থেকে
ইঁদুর বিদায়।

Pussy Cat, Pussy Cat



৫

হামটি ডামটি উঁচু দেয়ালে
বসেছিল, পড়ে খান-খান হল রে!
রাজার যা হাতি ঘোড়া সৈন্য সেপাই
হামটিকে জোড়া দিতে পারল না হায়।

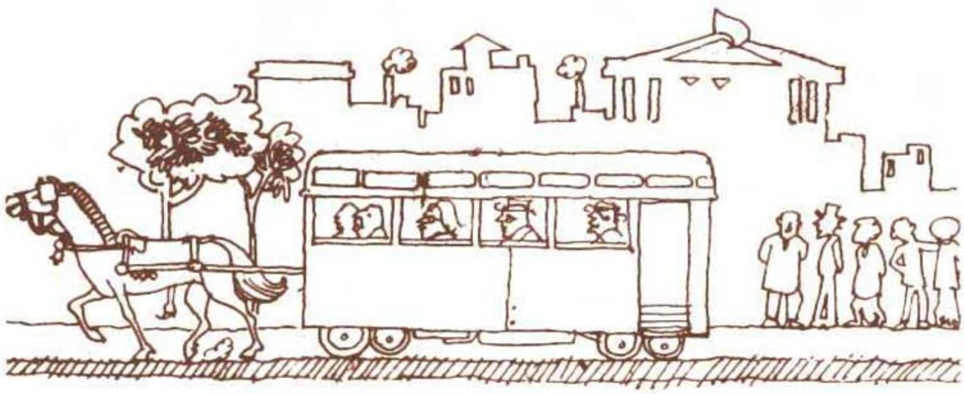
Humpty Dumpty sat on a wall

ছবি: শান্তনু দে

ঘোড়ায় টানা ট্রামের গল্প

সরল দে

দাদুর মতো ভালো বন্ধু কে আর ছিল, আমার ছেলেবেলায়! স্কুলের বন্ধুরা তো স্কুলেই, কিন্তু দাদু যে আমার সর্বক্ষণের বন্ধু, ঘর থেকে শুধু দু'পা ফেলে বেড়ানোর গাইড, আমার গল্প-বলা বুড়ো।



তখন আমাদের বাড়ি ছিল সালকিয়ার হাওড়া রোডে। ট্রামলাইনের ধারে। হ্যাঁ, হাওড়ায় তখন ট্রাম চলত। দাদুর সঙ্গে বিকেলের নরম আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছি, রোজ যেমন যাই। দাদুর এক হাতের মুঠোয় আমার কচিহাত, আর-এক হাতে রুপোর বাঁটের ছড়ি।

একটা ট্রাম টিংটিং করে হাওড়া স্টেশন থেকে বাঁধাঘাটের দিকে যাচ্ছে। ট্রামের টিকি ওপরের তারে ঠেকানো। চিড়িক চিড়িক করে সেখানে আগুনের ফুলকি দেখে আমি অবাক হই। রোজই।

তো সেদিন দাদুর হাতে টান দিলুম— আচ্ছা দাদু, ট্রামের টিকিতে ফুলঝুরি কেন? দাদু আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বলল, ইলেক্ট্রিকের কারেন্টে ট্রাম চলে তো, তাই। আগে ঘোড়ায় ট্রাম টানত।

ঘোড়ায় ট্রাম টানত! দাদুর কথায় আমি তো হাঁ।

বলতে বলতে আমরা তখন বাঁয়ে ঘুরে চেলোপটির ঘাটে। ওই ঘাটের সিঁড়ির ধাপে দাদু, পাশে আমি।

মাঝগঙ্গায় শুশুক ডিগবাজি খায়। ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার যায়। ঢেউ ওঠে। নৌকো দুলে ওঠে। ঘাটের সিঁড়ির নীচে ঢেউ আছড়ায়—ছলাৎছল। আমি দৃশ্য দেখি আর দাদুর গল্প শুনি।

সেদিন ঘোড়ায় টানা ট্রামের গল্প বলেছিল দাদু। তখন দাদু বাসাবাড়িতে থাকত কলকাতার হাতিবাগানে। বুড়োদাদু নয়, জোয়ান দাদু। ঘোড়ায় টানা ট্রামে দাদু অফিসে যেত, বাড়ি ফিরত।

একদিন হল কী, মাঝপথে হঠাৎ ট্রাম গেল থেমে। কী হল? ট্রামের প্রায় সবাই অফিসবাবু। তারা হৈহৈ করে উঠল। ও ড্রাইভার ভাই, অফিসে লেট হবে যে! ঘোড়া ছোটালেও ট্রাম-চালককে কেউ কোচোয়ান বলত না। সে ড্রাইভার।

কিন্তু ঘোড়া যে নড়ে না। এক কদমও না পিঠে সপাং সপাং চাবুক, তবুও। রাস্তায় তখন ভিড় জমেছে। কেউ মজা দেখতে, কেউবা সাহায্যের হাত বাড়াতে। দৌড়ে এল লালমুখো পুলিশ সার্জেন। কী হল? ঘোড়ার কি পথেই ঘোড়া-রোগ!

ভিড়ের মধ্যে লাঠি হাতে এক বুড়ি ছিল। সে চেঁচিয়ে বলল, ও বাছা, ঘোড়া কি দানাপানি পায়নি?

সত্যিই তাই। সেদিন তাড়াহুড়োয় দানাপানি পায়নি ঘোড়া। ট্রাম ছেড়েছে ঠিক সময়ে। অফিস টাইম তো। পানি পথের মোড়ে। চৌবাচ্চায়। দানা ট্রামেই মজুত। কিন্তু দানাপানি পেটে পড়লে তবেই ঘোড়া নড়বে। ট্রাম চলবে।

ট্রাম তখন ফাঁকা। প্রায় সবাই অফিসবাবু। তারা ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে অফিসমুখো। দাদু কিন্তু শেষ দেখা দেখে অফিসে যাবে। লেট হয় হোক।

শেষ পর্যন্ত ঘোড়া দানাপানি পেয়ে টগবগিয়ে উঠল। ছুটল। ট্রাম চলল গড়গড়িয়ে।

দাদুর মুখে শোনা সেই গল্প মনে পড়ল, 'ছেলেবেলা'র প্রথম সংখ্যার একটি লেখা পড়ে। উষা মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ঘোড়ায় টানা ট্রাম'। তিনি তাঁর ছেলেবেলায় স্বচক্ষে দেখেছিলেন সেই ট্রাম। সেই স্মৃতিচিত্র।

গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু জানবার কথা এবার বলি, যা জেনেছি। কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলেছিল ১৮৭৩ সালে, ২২ ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু আবার নতুন করে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলেছিল ১৮৮২-র নভেম্বরের ১ তারিখে। লর্ড রিপন উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার মানুষ সেদিন উপচে পড়েছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখতে। সে ঘোড়া আনা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে। তেজি ঘোড়া।

বুড়ো-বুড়ির বাটপারি





ফরাসি দেশের নর্মান্ডি প্রদেশে সব গৃহস্থবাড়িতেই আগে গরুর খুব কদর ছিল। সেখানকারই এক প্রাচীন গল্প ফিরে শোনাচ্ছেন মৈত্রেয়ী নাগ।



অনেক যুগ আগে এক বনপাহাড়ি গ্রামে থাকত এক বুড়ি। ঝলসানো মাংস বেশ রসিয়ে কসিয়ে খেতে তার ভারি ভালো লাগত। মুশকিল হল, তার বুড়োর আবার এই ব্যাপারটায় ঘোর আপত্তি ছিল, তাই বুড়িকে খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ সারতে হত। একদিন সকালে বুড়ো গিয়েছে খেতের কাজে, বুড়িও বসেছে মাংস ঝলসাতে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় কাটা দরজার ওপরের ফাঁকটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। বাড়ির গরুটা তখন পাশের মাঠে চরছিল, ঘাস খাওয়ার ফাঁকে মাঝেমাঝেই মাথা তুলে সে দেখছিল বুড়িকে। সে যুগে পশুপাখিরা মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কথা কইতে পারত। বুড়ির ভয় হল, গরুটা না আবার বুড়োকে গিয়ে বলে দেয়। বুড়ি যতই তাড়া দেয়, গরুটা আবার ফিরে আসে আর চেয়ে দেখে সে কী করছে। শেষ পর্যন্ত বুড়ি একটা কোদাল ছুঁড়ে মারল গরুর মাথায় আর গরুও অমনি মাটিতে পড়ে মরে গেল।

বুড়ির তো মাথায় হাত! মরা গরু নিয়ে বুড়োর কাছে মুখ দেখাবে কী করে?

'গরু মরে গেছে দেখলে আমাকেই না মেরে ফেলে! এই রইল আমার ঘর-সংসার, আমি বরং বনবাসে যাই', এই বলে সে সব ফেলে খালি দরজার ওপরটা ঢাকবার কাঠের তক্তাটা সঙ্গে করে বনের দিকে হাঁটা দিল। পথে দেখা হল বুড়োর সঙ্গে। সে বলল, 'এমনি করে কোথায় চলেছিস বুড়ি?'

বুড়ি বলল, 'আর কোথায়? বনবাসে। চোরে বাড়ির সব নিয়ে গেল, থাকার মধ্যে আছে কেবল এই দরজার মাথাটুকু।'

'কিছুই যখন নেই, আমিই বা ঘরে ফিরি কেন! আমিও তোর সঙ্গে বনবাসে যাই।'

এই বলে বুড়োও বুড়ির সঙ্গে চলতে লাগল। বনে পৌঁছে দুজনেরই মনে হল নতুন জীবন শুরু করার আগে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক, তাই তারা বিরাট একটা ঝাউগাছের তলায় কাঠটা পেতে বসল। একটু পরেই একদল লোক সেই বনে এসে পড়ল। বুড়োবুড়ি ভয় পেয়ে তক্তা সমেত তড়বড়িয়ে গাছটার মগডালে চড়ে দেখে লোকগুলোও, বাছবি তো বাছ, ঠিক ওদের ঝাউগাছটার তলাতেই এসে আড্ডা গাড়ল।

ঠিক ওদের ঝাউগাছটার তলাতেই এসে আড্ডা গাড়ল।

আসলে এটা ছিল একটা চোরের দল। চুরি করে ফেরার পথে মরা গরুটা দেখে তাদের সর্দারের মনে হয়েছিল স্বয়ং ভগবান তাদের ভুরিভোজের বন্দোবস্ত করে দিলেন বুঝি। ভালো করে রেঁধে খাওয়ার জন্য তাদের একটা নিরিবিলি জায়গার দরকার ছিল। গাছের তলায় বসে গরুটার ছাল ছাড়িয়ে, বড় বড় পাথর জড়ো করে আগুন জ্বেলে, একটা বিরাট তাওয়া চাপিয়ে তার ওপর চোরেরা কাটা মাংসের টুকরোগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল।

নিজেদের গরুর ওই দশা দেখে বুড়োর আর সন্দেহ রইল না যে, এই চোরেরাই তাদের সর্বনাশ করেছে। এদিকে বুড়ি আর সামলাতে পারল না, সে মাথা চাপড়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

চোরেরা ওপরে তাকাল বটে, কিন্তু ঘন ঝাউপাতার আড়াল থাকায় কিছুই দেখতে পেল না। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তখন সর্দার বলল, 'ও কিছু না, বনের হাওয়া।'

কিন্তু চোরেরা তো আর বোকা নয়। এত বড় বনে নড়ছে কেবল একটা গাছের মাথা, তার ওপর অমন রক্ত হিম করা হু-হু আওয়াজ, একদিকে দত্যির ভয় আর অন্যদিকে মাংসের লোভ। তারা নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলে যেতে লাগল।

এদিকে, বোধহয় চোখ মুছতে গিয়েই, বুড়ির হাত থেকে তক্তাটা ফসকে গেল। গাছের ডালে ডালে খটাখট খটাখট খটাখট শব্দ করতে করতে সেটা পড়তে লাগল। চোরেরা অবশ্য কী পড়ল দেখার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল না। টাকাকড়ি, বাসনকোসন, খাবারদাবার সব ফেলে রেখে দে ছুট। তাদের সর্দার দৌড়চ্ছিল সবার আগে, কেননা তার মনে হয়েছিল, গোটা ব্যাপারটায় ভগবান নয়, শয়তানের হাত আছে।

কাণ্ড দেখে বুড়োবুড়ি হুড়মুড়িয়ে গাছ থেকে নেমে যা পারে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। চোরের ওপর বাটপাড়ি করে টাকা-পয়সা নেহাত কম পায়নি তারা। তাই দিয়ে বাড়িঘর মেরামত করে আবার একটা নতুন গরু কিনে তারা সুখে ঘর করতে লাগল। বুড়ির অবশ্য খুব শিক্ষা হয়েছিল। ঝলসানো মাংস খাবার বেয়াড়া ইচ্ছে হলে সে খেয়াল করে দরজাটা খুব কসে এঁটে নিত।

ছবি: শান্তনু দে

ঘুম পাড়ানি ছড়া

অঙ্কন রায়

তাকাও কেন? ঘুম আসে না?
ওদিক পানে মামদো ভূতের বাস!
ওই যে জলের ওই পারে এক
ছাগলছানা খাচ্ছে কচি ঘাস...

তার পিছনেই বটগাছটায়
ঝুলতে থাকা বটের ঝুরি বেয়ে
একটা ছোট মামদো শিশু
নামছে, এবার যাবেই ওদিক ধেয়ে! ...

যেদিক দিয়ে ছাগলছানা
একটু একটু এগোয় লোকালয়ে,
সেই দিকে যে অজ পাড়াগাঁ,
সেইখানে সব বাসিন্দারা ভয়ে

দরজা-কপাট আটকে রেখে
লুকিয়ে থাকে ভর দুপুর-বেলা।
মামদো ছানা সময় বুঝে
বাড়ির চালে ছুঁড়বে মাটির ঢেলা।

তাইতো বলি কখন যে কার
মাথায় পড়বে ভূতের ছোঁড়া ঢেলা
তার-চে বরং ঘুমিয়ে পড়ো,
সকালে ফের লেখা, পড়া, খেলা।



মানার বেড়াল

শুভাশিস ঘোষ

মোটেই খেতে চাইত না ভাত
ছোট্ট মেয়ে মানা,
মন ভোলাতে একদিন তাই
বেড়াল হল আনা!

সেই বেড়ালকে কে সামলাবে
স্বভাবটা তার বাজে—
দুমকা জেলার বিরু যাদব
বহাল হল কাজে!

মানা বড় হতেই হঠাৎ
বেড়াল হল হাওয়া
থানা-পুলিশ করেও তাকে
গেল না আর পাওয়া!

বছর ঘুরে গেল তবু
বেড়াল নিরুদ্দেশ
বিরু থেকেই করবে কী আর
গেল বিরুর দেশ!!

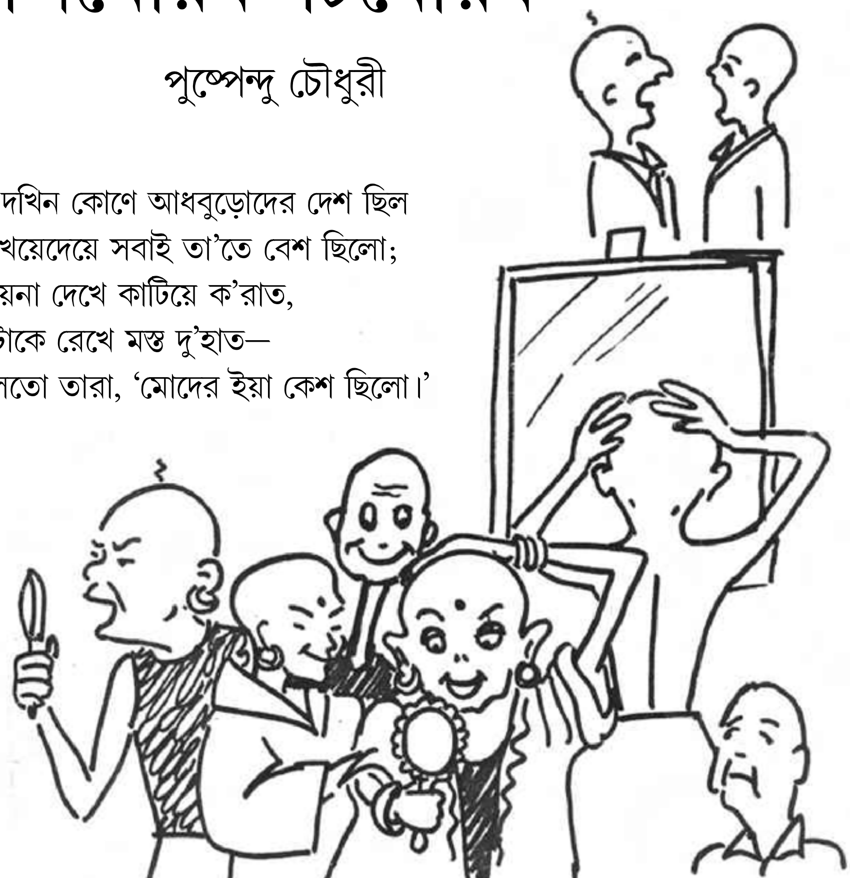


ছবি: শান্তনু দে

লিমেরিক টিমেরিক

পুষ্পেন্দু চৌধুরী

সাগরপারের দখিন কোণে আধবুড়োদের দেশ ছিল
নেচে-কুঁদে খেয়েদেয়ে সবাই তা'তে বেশ ছিলো;
আয়না দেখে কাটিয়ে ক'রাত,
টাকে রেখে মস্ত দু'হাত—
মুচকি হেসে বলতো তারা, 'মোদের ইয়া কেশ ছিলো।'





পাড়ার সেরা মস্তান সে— স্বপন কুমার বেরা
দেখলে মানুষ আস্ত মাথা ছাড়তো করে নেড়া!
কালিঘাটে গিয়ে নাকি
দিয়ে সবার নজর ফাঁকি—
রোজ বিকালে চুরি করে খেতো শুধুই পেঁড়া!!

ছবি: রাণা দেববর্মণ

গাছদাদু

তরুণকুমার সরখেল

বিশাল মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছটা। একটাই বড় গাছ। তার ডালপালা ছেয়ে আছে অনেকখানি। তবে শরীরের জোর আর আগের মতো নেই। কোটরে কোটরে ধরেছে পচন। তা হোক, তবু মনের জোর হারায়নি সে।

বড় গাছটার চারপাশে গজিয়ে উঠেছে অনেক ছোট ছোট চারাগাছ। বাচ্চা-শিশুর মতো ছোট গাছগুলো দু-হাত নেড়ে বড় গাছটার কোলে উঠতে চায়, ওর পা জড়িয়ে ধরতে চায়। আনন্দে একসঙ্গে মাথা নাড়তে থাকে আর জ্যোৎস্না-রাতে একসঙ্গে খিল খিল করে হাসে। তা দেখে বড় গাছটার আনন্দ আর ধরে না। ছোট গাছগুলো বড় গাছটাকে গাছদাদু বলে ডাকে। একদিন সবাই মিলে গাছদাদুকে বলল, গাছদাদু আমাদের একটা গল্প শোনাও না। পুরনো দিনের গল্প শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগে।

গাছদাদু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কত গল্পই তো জমা রয়েছে এই বুকে। সেই কবে জন্মেছিলাম এই মাঠে। তখন এ মাঠটার নাম ছিল ধূপগড়। এখানে চারপাশে এত গাছ ছিল যে সূর্যের আলো ভেতরে প্রবেশ করত না। পায়ের কাছে দিনরাত বন্য জন্তু আর বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াত। ডালে ডালে কতরকম পাখি বাসা বাঁধত। কালবৈশাখীর সময় বন কাঁপিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠত। বর্ষার দিনে বনে সাড়া পড়ে যেত। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেটে যেত দিনরাত। আর এখন? শূন্য মাঠে আমি একা। তবু তোদের কাছে পেয়েছি বলেই বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। তা গল্প শুনবি এ আর এমন কী কথা! যে কটা দিন বাঁচি রোজ তোদের গল্প শোনাব।

মাসটা ছিল আশ্বিনের মাঝামাঝি। আর দু-দিন পরেই দেবী দুর্গার বোধন। জমিদার বিষ্ণু রায়ের আত্মীয়েরা সকলেই জড়ো হয়েছেন। সুখের হাট বসে গিয়েছে জমিদারের আটচালায়। দেবী দুর্গার মূর্তিতে রং হচ্ছে। এমন সময় রাতে ডাকাত পড়ল সেই বাড়িতে। সিন্দুক ভেঙে ডাকাতরা জমিদার বাড়ি লুঠ করল। লেঠেলরা ডাকাতদের তলোয়ারের ঘায়ে ছিটকে পড়ল। জমিদার বিষ্ণু রায় লুকিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু তার একমাত্র পুত্র অনন্ত রায় ডাকাতের হাতে প্রাণ হারালেন। মায়ের বোধন আর হল না। শোকের ছায়া নেমে এল জমিদার বাড়িতে। বিষ্ণু রায় শয্যা নিলেন।

তার দুয়েকদিন পর দেখি ডাকাতরা আমারই পায়ের নীচে বসে সোনাদানার ভাগ বাটোয়ারা করছে। একসময় তাদের নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল বাঁধল। প্রথমে হাতাহাতি ও শেষে তলোয়ার নিয়ে মারামারি শুরু হল। একজন ছাড়া সবাই



তলোয়ারের কোপে মারা পড়ল। যে বেঁচে ছিল সে সমস্ত সোনাদানা আর টাকা একটা পুঁটলিতে বেঁধে আমার কোটরে রেখে দিয়ে জল খেতে গেল। আর ফিরল না। সাপের কামড়ে মারা গেল।

এইভাবে জমিদার পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ হল। আর আমি চুরি যাওয়া সম্পত্তি বুকে আগলে রইলাম এই এতকাল ধরে। কাউকে বলতে পারিনি।

বিষ্ণু রায়ের জমিদারি একসময় চলে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটাও ছিল তার জমিদারি। একদিন দেখলাম বিষ্ণু রায় আমার ছায়ায় বসে একা একা নীরবে চোখের জল ফেলছেন। সেদিন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়ত তাঁকে সান্ত্বনা দিতাম। বলতাম আমার কোটরে সমস্ত চুরি যাওয়া সম্পত্তি রাখা আছে। এর ভার আর বইতে পারি না। এসব ঘরে নিয়ে যাও।

গল্প বলতে বলতে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। গাছদাদু সেই ক্ষীণ আলোতে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না। পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে মন তার ব্যথায় ভরে গিয়েছে।

৩০ বছর আগের ‘ছেলেবেলা’ থেকে

প্রথম পাতা



দুঃখী হনুমান

একদিন স্কুলে তখন আমাদের প্রথম পিরিয়ড চলছে, বাইরে হঠাৎ ভীষণ সোরগোল শুনতে পেলাম। দেখলাম কয়েকজন মেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। আমি ভাবলাম, ট্রেন দেরি করেছে তাই বুঝি ওভাবে ছুটছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা মস্ত বড় হনুমান এসে দিদিমণিদের ঘরের সামনে বাঁদরামি করছে। আমি তো দেখেই ‘‘দিদিমণি, হনুমান’’ বলে চিৎকার করে উঠি। হনুমানের আর তাতে কী হবে। সে ততক্ষণে সমস্ত স্কুলটা তোলপাড় করতে লেগে গেছে। কিছুতেই স্কুল ছেড়ে যাবে না। আমরা ভাবলাম, ওর বোধহয় শখ হয়েছে আমাদের সঙ্গে পড়াশুনো করবে। ঘটনাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়, কিছুদিন আগে ‘ছেলেবেলা’র প্রথম সংখ্যায় দেখলাম যে পাখিও নাকি গুনতে জানে— তাহলে হনুমানও পড়াশুনো করতে চাইবে না কেন? আসল কথাটা কিন্তু জানলাম পরদিন। ওই হনুমানের একটা সঙ্গী ছিল। দুজনের মধ্যে খুব ভাব। একদিন হনুমানদুটো ৯৭-এ বাসের মাথায় করে আসছিল, হঠাৎ রাস্তার ইলেক্ট্রিকের তারে শক লেগে তাদের একজনের সেখানেই মৃত্যু হয়। অন্যজন ভীষণ দুঃখ পেল। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না যে, ও কীভাবে মরল। ও ভাবল রাস্তার লোকেরা বুঝি মেরে ফেলেছে। সেই থেকেই হনুমানটা এরকম অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়। তবে আমাদের স্কুলেই বেশি।

মুনমুন চক্রবর্তী, দশম শ্রেণী, রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, বারুইপুর, ২৪ পরগনা।

কলকাতা থেকে বহুদূরে
আমরা থাকি দুর্গাপুরে।
স্কুলে যাই, করি খেলা
কাটছে হেথায় ছেলেবেলা।



অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৯ বছর), ফার্টিলাইজার কলোনি, দুর্গাপুর-১২

আমড়া গাছের ডালে
ব্রহ্মদৈত্যি দোলে।
লম্বা কালো ঠ্যাং
ঝুলছে ড্যাং ড্যাং।



আমি কিন্তু ভাই,
ভয় পাই নাই।
কেবল দৌড়ে ফিরে বাড়ি
‘মা’ বলে ডাক ছাড়ি।

প্রিয়ব্রত দে (১০ বছর ৬ মাস)

আমাদের মিনি

আমাদের বাড়িতে একটা মিনি আছে। ওকে কিন্তু আমরা পোষ মানাব বলে আনিনি। মাস কয়েক আগে ও হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে উঠল। বাবার চটির শব্দ শুনলে মিনি মা-র পিছনে লুকত। বাবা ওকে না দেখলেই খোঁজ নেয়— মিনি কোথায়, মিনি কোথায়?

তোমরা কি কখনও শুনেছ যে বিড়াল মানুষের ওপর হিংসা করে? কিন্তু আমাদের মিনি আমার ওপর খুব হিংসা করে। আমার মা যদি আমাকে আদর করবার ছলে বুড়ি বুড়ি বলে ডেকে কোলের সামনে বসায় তাহলেই মিনি লেজ তুলে ছুটে আসবে। আমাকে না তুলে ওর শান্তি নেই। মা ওকে যখন আদর করে তখন ও মাকে যে কত আঁচড় আর কামড় দেয় তার গোনা গুনতি নেই। রাতেও আমাকে মা-র কাছে দেখলে মিনি আর অন্য কোথাও শুতে যাবে না। আমাদের মশারির মধ্যে ঢোকার জন্য ম্যাও ম্যাও করবে আর চারপাশে ঘুরবে।

রীতা চক্রবর্তী (বুড়ি) (১০ বছর)
চতুর্থ শ্রেণী, টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়



আমার বোন টুনটুনি
ভালো নাম তার মৌসুমি
খেলে নিয়ে ঝুমঝুমি।
শুরু করলে কান্না
থামতে সে আর চায় না
তার যে অনেক বায়না।

সোনালী সিনহা, প্রথম শ্রেণী, চার্চ স্কুল, জামশেদপুর।

৩০ বছর আগের 'ছেলেবেলা' থেকে

প্রথম যাত্রা

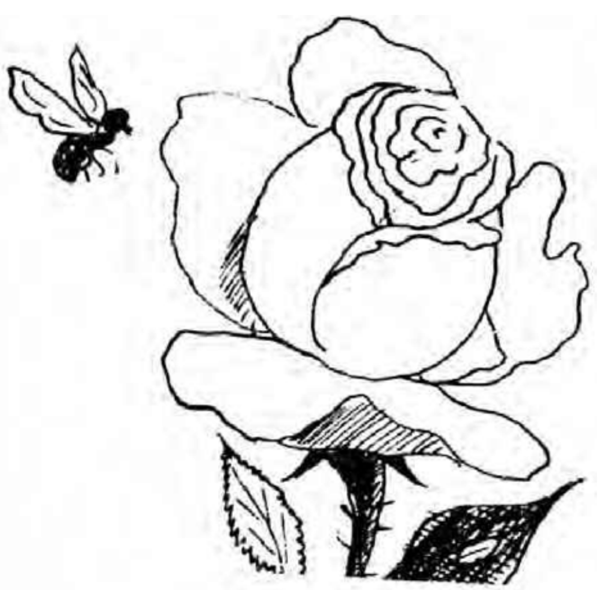


এক যে ছিল কন্যা
নামটি তার বন্যা।
তার ছিল এক পুতুল
পুতুলের নাম তুতুল।
পুতুল শুধুই কাঁদে
কন্যা শুধু রাঁধে।

কমলিকা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণী

একটি গোলাপের জন্য

জানো আমি খুব গোলাপ ফুল ভালোবাসি। তাই আমাদের নতুন বাড়িতে বাবাকে দিয়ে একটা গোলাপ গাছ কিনে লাগিয়েছিলাম। গাছটা এত ছোট যে দেখলে মায়া হয়। তাই প্রথম থেকেই খুব যত্ন করতে লাগলাম। রোজ জল দিতাম আর কত বড় হয় তাই দেখতাম। একদিন দেখলাম যে কচি কচি লাল পাতা হল। তাই দেখে আমার কী যে আনন্দ হল কী বলব? কিন্তু ফুলটা যে কী রঙের হবে



তা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। সেই রং দেখবার জন্য মনটা খুব চঞ্চল হয়ে থাকত। একদিন সকালে দেখলাম একটা ছোট কুঁড়ি হয়েছে, আর জানো, সেই কুঁড়িটার চারপাশ খুব ভালো করে দেখতে লাগলাম। মনে হল লাল রং হবে। আনন্দে স্কুলে বন্ধুদের বললাম। সারাদিন সেই আনন্দেই কাটল। কারণ তারপরের দিনই ফুলটা ফুটবে। সেইদিন খুব ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি গাছের কাছে গিয়েছি, কিন্তু হায়! কে বা কারা আমার সেই মিষ্টি ছোট, সোনা গাছটা নিয়ে গিয়েছে। আমি খুব কাঁদলাম। ভাবলাম কোনওদিন গোলাপ ফুল ভালোবাসব না।

সুমনা সরকার, দ্বিতীয় শ্রেণী, ফ্লোরা ইংলিশ স্কুল, ৫ এইচ বি টাউন, সোদপুর, ২৪ পরগনা।

হীরের টুকরো

বুলা চৌধুরী

বুলা চৌধুরীর নাম এখন দেশজোড়া। টানা পাঁচ বছর ধরেই ও ছোটদের সাঁতারে ভারতের সেরা। ৭৯, ৮০ ও ৮১ পরপর তিন বছর দশ বছরের কম বয়সের বিভাগে আর ৮২ ও ৮৩-তে তেরো বছরের কম বয়সের বিভাগে বুলা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। গত বছর দিল্লির এশিয়াডে ও পঞ্চম হয়েছিল।

সাঁতারে বুলার হাতেখড়ি ওর বাবার কাছে, যখন ও সবে হাঁটতে শিখেছে, ওদের হিন্দমোটরের বাড়ির বাগানের পুকুরে। তারপর পাঁচ বছর বয়সে চাতরা সুইমিং ক্লাবে পশুপতি কুণ্ডুর কাছে শিখতে শুরু করে। বুলা এমনিতে খুব লাজুক, তবে মুখে হাসি লেগে আছে সব সময়। ও পড়ে লিলুয়ার ডনবস্কো স্কুলে। বাড়ির সকলেরই ওর প্রতি খুব নজর। বড় হয়ে বুলা বিশ্বের নাম করা সাঁতারু হতে চায়।

'প্রতিদিন কতক্ষণ সাঁতার কাটো?'

'এশিয়াডের আগে রোজ ১০ হাজার মিটার কাটতাম, এখন একটু কম।'

'এশিয়াডে কেমন লেগেছিল?'

'এমনিতে খুব আনন্দ হয়েছিল' কিন্তু মন খারাপ লেগেছিল বিদেশিদের সাঁতার কাটার কায়দা-কানুন দেখে। ওঁরা কত এগিয়ে! তুলনায় আমরা অনেক কিছুই জানি না। তবে স্ট্রোক আর স্পিডে আমি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি।'

'বিদেশে গিয়ে আরও ভালো কোচিং নেওয়ার ইচ্ছে করে?'

'একদম না। দিল্লির তালকোটরা সুইমিং পুলের মতন ভালো পুলে সারা বছর সাঁতার কাটার সুযোগ পেলে অলিম্পিক থেকে সোনা আনতে পারব।'

'সাঁতারের কোন স্ট্রোক তোমার ভালো লাগে?'

'বাটারফ্লাই।'

'সাঁতার ছাড়া আর কী কর?'

'ক্লাসের পড়াশুনো তো আছেই তাছাড়া গল্পবই পড়ি, তার মধ্যে কমিক্স বেশি, আর গান শুনি আর মাঝে মাঝে পুতুল খেলি। তবে সুযোগ পেলেই বাড়ির পুকুরে সাঁতার কাটি।'

'সে সময় তোমার সঙ্গী কে?'

'জলে আমার সঙ্গী আমাদের পোষা কয়েকটা হাঁস। ওরা আমাকে ভয় পায়। আমি ওদের তাড়া করি, ওরা ডুব দেয় আর ভাসে। আমিও তাই করি। ওদের ধরতে না পারলে আমার জেদ বেড়ে যায়। তবে না ধরে ছাড়ি না। পুকুরে ওরাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আর ওই সময় আমার প্রিয় কুকুর টমি চুপটি করে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি জল থেকে না ওঠা পর্যন্ত।'

শিশির চক্রবর্তী



মাছরাঙা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাছরাঙা রে, মাছরাঙা
ঠোঁটের দুপাশ লালচে-তিল
পালকগুচ্ছ সবুজ-নীল
তোর বিলাস কি শাখায় বসে
শুধুই আড়ামোড়া ভাঙা?

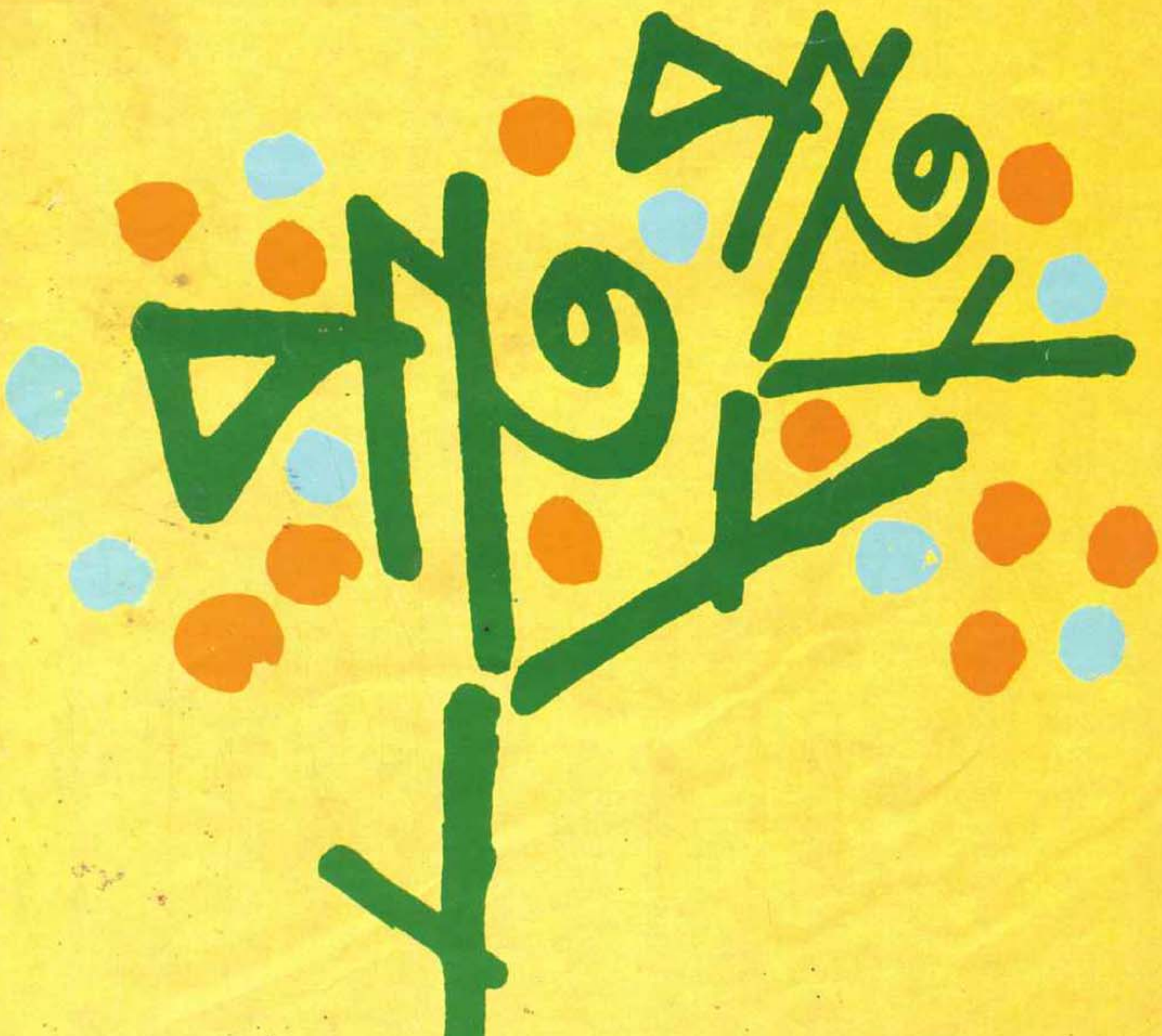
হঠাৎ উড়ে জলের ধারে
বসলি এসে বাঁশের আড়ে
তক্কে তক্কে আছিস বসে
লেজটি তুলে পালক ঘসে
যেই না চুনো ভাসল জলে
প্যাঁচ কষলি কি তলে তলে
ছোঁ মেরে সেই মাছটা নিয়ে
পালিয়ে গেলি ডাঙা!

মাছরাঙা রে, মাছরাঙা
মাছগুলোর কি উচিত হবে
দল বেঁধে তোর ঠ্যাং ভাঙা!

ছবি: অর্ক পৈতণ্ডী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

পাতাহরপ



পুরনো ‘পাতাহরপ’ থেকে পুনর্মুদ্রিত

ভগবান সত্য দেখতে পান, কিন্তু অপেক্ষা করেন

মূল লেখক: লেও নিকোলায়েভিচ তলস্তয় অনুবাদক: দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্লাদিমির শহরে ইভান দিমিত্রিচ আকসিয়োনভ নামে যুবাবয়সি ব্যবসায়ী থাকত, শহরে তার দুটি দোকান আর একখানা নিজস্ব বাড়ি।

সুপুরুষ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আকসিয়োনভের, ফুর্তিবাজ, গান গাইতে ভালোবাসে। উঠতি বয়সে ভয়ানক মদ খাওয়া, আর খেয়ে হুজ্জুতি বাধাবার রোখ ছিল, বিয়ের পরে কখনও-সখনও অল্পস্বল্পের বাইরে আর যায় নি।

এক গ্রীষ্মের দিনে নিজনীর মেলাতে যাওয়ার মন করে বৌয়ের কাছে এল বিদায় নিতে। বৌ বলল, আজ কিন্তু তুমি বেরিয়ো না, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি রাতে।

আকসিয়োনভ বলল, বুঝেছি, ভয় পাচ্ছ মেলায় গিয়ে ফের ফুর্তিতে বেরাশ হয়ে পড়ব, তাই তো?

বৌ বলে, কিসের ভয় তা জানি না, শুধু খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি এইটুকুই জানি। দেখলুম নিজনী থেকে ফিরে তুমি টুপিটা খুললে, চুলগুলো তোমার ধবধব করছে সাদা।

আকসিয়োনভ হাসল। সে তো সুলক্ষণ। মেলায় বেচাকেনা যা হবে তার থেকে তোমার জন্যে সুন্দর একটা কিছু কিনে আনব। দেখো আনি কি না।

বিদায় নিয়ে ঘোড়া জুতে সে বেরিয়ে পড়ল।

আধা পথ গেছে, চেনা-পরিচিত আর-এক ব্যবসায়ীর সাথে দেখা। ভালোই হল। দুজনে একত্র হয়ে একটা সরাইয়ে গিয়ে উঠল রাত কাটাবার জন্যে। একসঙ্গে বসে চা খেল দুজনে, শুতে গেল পাশাপাশি ঘরে।

বেলা অবধি ঘুমনো আকসিয়োনভের স্বভাব নয়। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যেতে পারবে বলে শেষ রাতেই উঠে পড়ল সে। গাড়োয়ানকে জাগিয়ে ঘোড়া জুততে বলল।

যাওয়ার কালে সরাইমালিকের সাথে দেখা করে (সরাইয়ের পেছনে একটা বাড়িতে থাকতেন তিনি) দাম চুকিয়ে আবার শুরু করল তার যাত্রা।

প্রায় পঁচিশ মাইলের মতো একটানা চলবার পর থামল সে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে নেবার জন্য। রাস্তার ধার অবধি এগিয়ে এসেছে এ সরাইয়ের গাড়ি বারান্দা, সামোভারে জল ফুটিয়ে দেবার জন্যে বলে মাঝখানের সময়টুকু সে সেখানে বসে গিটারটা বের করে আওয়াজ তুলতে শুরু করে দিল।



হঠাৎ তিন ঘোড়ার একটা ত্রয়কা ঘুন্টি বাজিয়ে আসতে আসতে থেমে গেল সামনাটাতে, একজন সেনা অফিসার নামলেন দুই সৈন্যকে পিছনে নিয়ে। তারপর সোজা আকসিয়োনভের কাছে এসে জানতে চাইলেন তার পরিচয়, আর কোথা থেকে আসছে সে। আকসিয়োনভ সোজাসুজিই জবাব দিলে, তারপর জানতে চাইল একটু চা খাবেন কিনা তার সাথে। কিন্তু অফিসারটি তাকে সমানেই জেরা করতে লাগলেন, কাল সে রাত কাটিয়েছে কোথায়। একা? না আর-কোনও ব্যবসায়ী ছিল সঙ্গে। সঙ্গী ব্যবসায়ীর সাথে সকালে দেখা হয়েছিল তার? ভোর ফোটার আগেই বা সে সরাই ছাড়ল কেন?

আকসিয়োনভের অবাক লাগছে পর পর এইসব প্রশ্ন শুনে। এমনভাবে জেরা করছেন কেন? আমি কি চোর না ডাকাত? আমার নিজের ব্যবসার তাগিদে আমি বেরিয়েছি, এত সব প্রশ্ন আমায় করার কী মানে?

অফিসারটি বললেন, আমি এ জেলার পুলিশ অফিসার, আর প্রশ্ন করছি কেন? যে ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুমি কাল রাত কাটিয়েছ তাকে আজ পাওয়া গেছে গলার নলি কাটা অবস্থায়। তোমার মালপত্র আমরা তল্লাশী করব।

তারা সটান সরাইয়ে তার ঘুরে ঢুকল, তার ব্যাগ খুলে হাতড়াতে শুরু করল। হঠাৎ ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে আনলেন অফিসার ''এটা কার ছুরি?''

আকসিয়োনভ তাকাল। তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা রক্তমাখা ছুরি বেরিয়েছে দেখে ভয় পেয়ে গেল সে।

"ছুরিতে রক্ত লাগল কী করে?"

আকসিয়োনভ উত্তর দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কথা ফুটল না, শুধু তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, "আমি— আমি জানি না। ও ছুরি আমার নয়।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "আজ সকালে ব্যবসায়ীকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে, গলার নলিটা কাটা। তুমিই একমাত্র লোক যে এটা করতে পারে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা ছিল, আর কেউ ছিলও না। এখন তোমার ব্যাগ থেকে এই রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গেল। তোমার মুখ, তোমার হাবভাবও তোমার বিরুদ্ধে বলছে। এখন বলো কিভাবে মেরেছ আর কত টাকা সরিয়েছ তার পুঁজি থেকে।"

আকসিয়োনভ দিব্যি করে বলতে লাগল এ কাজ তার নয়, সে করে নি। একসঙ্গে কাল চা খেয়েছে দুজনে, কিন্তু কালকের আগে ব্যবসায়ীকে সে কখনও দেখেও নি। তার কাছে তার নিজের আট হাজার রুবেলের বেশি কোনও টাকাও নেই, আর ও ছুরিও তার নয়। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তার গলা ভেঙে গেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আর কথা বলতে গিয়ে এমন কাঁপছে যেন সেই অপরাধী।

পুলিশ অফিসার সঙ্গের সেনাদের বললেন আকসিয়োনভকে বেঁধে গাড়িতে তুলতে। তার দু পায়ে বেড়ী দিয়ে যখন তাকে গাড়িতে ছুঁড়ে দেয়া হল, বুকে ক্রুশচিহ্ন করে করে কাঁদতে লাগল। তার টাকাকড়ি মালপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাছের একটা শহরে তাকে চালান করা হল। সেখানে সে কারাবন্দী হল। তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর করা হল ভ্লাদিমির শহরে। শহরের বাসিন্দারা, ব্যবসায়ীরা জানাল, আগে মদ খেত আর টই টই করে বেড়াত বটে, কিন্তু মানুষটা ভালো। বিচারের দিন এল। রিয়াজনের এক ব্যবসায়ীকে খুন করে তার বিশ হাজার রুবল হাতিয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের হল তার বিরুদ্ধে।

তার বৌ পড়ল মহাবিপদে, ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে কি করবে না সে ধন্দেতে পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা খুব ছোট, একটা একেবারে দুধের শিশু। তাদের সঙ্গে নিয়ে সে জেলে গেল স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রথম তো দেখা করার অনুমতিই মেলে না, অনেক কাকুতি-মিনতি করে শেষ পর্যন্ত মিলল অনুমতি, জেলকর্মীরা তাকে নিয়ে গেল স্বামী যেখানে আছে সেখানে। হাতে পায়ে শেকল পরা স্বামীকে যখন দেখল চোর-বদমাইশদের সঙ্গে, হাত পা অবশ হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরল অনেকক্ষণ পর। তখন বাচ্চাদের টেনে নিয়ে বসল গিয়ে সে স্বামীর কাছটাতে। বাড়ির খবর সব বলল একে একে, জানতে চাইল কী হয়েছিল তার। আকসিয়োনভ খুলে বলল সব কথা। বৌ বলল, এখন তাহলে কী করব আমরা?

জারের কাছে আবেদন করতে হবে, নির্দোষ একটা লোকের জীবন যাতে ধ্বংস না হয়।

বৌ বলল, একটা দরখাস্ত সে ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছিল জারের কাছে, কিন্তু সে দরখাস্ত নেওয়াই হয় নি।

আকসিয়োনভ উত্তর করল না, শুধু হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো দেখাল তাকে।

বৌ বলল, মনে পড়ছে, সেই বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে? মনে পড়ছে? সেদিন তোমার বেরনো উচিত হয় নি। তারপর তার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, বৌকে তোমার সত্যি কথাটা বলবে? বল, তুমি কি কাজটা করো নি?

"তুমিও সন্দেহ করছ আমায়।" হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল আকসিয়োনভ। আর তখনই এক রক্ষী এসে বলল, বৌ আর বাচ্চাদের এবার যেতে হবে। আকসিয়োনভ শেষবারের মতো তাদের বিদায় জানাল।

তারা চলে যেতে ফের সব কথা তার মনে ঘুরতে লাগল। যখন ভাবল বৌও তাকে সন্দেহ করেছে নিজেকে সে প্রবোধ দিল "কেবল ভগবানই্ জানতে পারেন সত্য কী। কেবল তাঁরই কাছে আবেদন করা যায়, কেবল তাঁরই দয়া আমরা আশা করতে পারি।"

বাইরের সব আশা ত্যাগ করল আকসিয়োনভ, আর কোনও আবেদনও করল না কারও কাছে। শুধু ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

বিচারে তার শাস্তি হল বেত্রাঘাত, তারপর সাইবেরিয়ার খনিতে গিয়ে কাজে লাগা। গাঁট বাঁধানো রাশিয়ান চাবুক হল নাউট, তাই দিয়ে সর্বাঙ্গে মারা হল তাকে, তারপর সে মারের ঘা শুকোতে অন্য দণ্ডিতদের সাথে চালান করে দেয়া হল সাইবেরিয়ায়।

ছাব্বিশ বছর ধরে দণ্ড ভোগ করল সেকর সাইবেরিয়াতে। বরফের মতো সাদা হয়ে গেল তার চুল, লম্বা, হালকা, সাদা হয়ে গেল দাড়ি। সব ফুর্তি চলে গেল তার, মাজা বেঁকে গেল, চলা মন্থর হয়ে গেল। কথা বলত সে অল্পই, কখনও হাসত না। শুধু মনে মনে প্রার্থনা করত সকল সময়।

জেলে বসে আকসিয়োনভ জুতো বানাতে শিখেছিল, তাইতো সামান্য যে টাকা পেত তা দিয়ে সাধুদের জীবনী কিনেছিল একখানা। যতক্ষণ আলো আসত জেলখানায়, সে পড়ত বসে। রবিবার দিনে জেলের গির্জায় বাইবেলের যীশুশিষ্যদের কথা সে পাঠ করত, প্রার্থনা-গানও গাইত, তখনও তার গলা যথেষ্ট ভালো।

তার নম্রস্বভাবের জন্য জেলের কর্তাব্যক্তিরা আকসিয়োনভকে পছন্দ করতেন। জেলবন্দীরাও তাকে সম্মান করে চলত। তারা তাকে 'ঠাকুরদা' বা 'সাধুবাবা' বলে ডাকত। জেলকর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কিছু নিয়ে আবেদন করতে হলে আকসিয়োনভকে করত তাদের মুখপাত্র, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধলে, মিটমাট করে দেবার জন্যে আসত তারই কাছে।

বাড়ির কোনও খবরই আকসিয়েনভের কাছে আসত না, তার বৌ-বাচ্চারা বেঁচে আছে কিনা তাও তার জানা ছিল না।

নতুন একদল কয়েদী এল একদিন। সন্ধ্যেবেলা পুরনোরা নবাগতদের ঘিরে জানতে বসল, শহরে না গাঁয়ে কোথায় ঘর

ছিল, আর দণ্ড কিসের জন্য। আকসিয়োনভও মনমরা হয়ে বসে শুনছে। আর সে কয়েদী— লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন, বয়স ষাট হবে, ছোট ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল— সে তখন বলছে কোন কারণে তাকে গ্রেফতার করা হল।

আরে ভাই, আমি শুধু স্লেজে জোতা একটা ঘোড়া খুলে নিয়েছি, আর আমায় ধরল চুরির দায়ে। বললুম, তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য ঘোড়াটা নিয়েছিলাম, তা ছাড়া স্লেজের চালক আমার বন্ধুলোক। চুরি নয়, এমনিই নিয়েছি, চটজলদি প্রয়োজনে। ওদের সেই এক কথা। না, তুমি চুরি করেছ। কোথায়, কিভাবে যে চুরি করলাম, তা কিন্তু বলতে পারলে না। একবার সত্যিই অন্যায় করেছিলাম। সেজন্য অনেক দিন আগেই হয়তো আমার এখানে আসা উচিত ছিল, সে সময় কিন্তু ওরা আমায় ধরতে পারে নি। আর এখন ধরল কিনা নিতান্ত অকারণে...না, একটু মিথ্যেই বললাম, আগেও একবার আমায় পাঠিয়েছিল সাইবেরিয়ায়। কিন্তু বেশিদিন থাকতে হয় নি।

কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি কোথায় তোমার?

ভ্লাদিমির। আমার সংসার সেখানে। আমার নাম মাকার, সবাই আমায় সেমিয়োনিচ বলে ডাকে।

আকসিয়োনভ শুনে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, সেমিয়োনিচ, ভ্লাদিমিরের ব্যবসাদার আকসিয়োনভদের কথা কিছু জানো? তারা কি আছে? বেঁচে আছে?

কেন জানব না। নিশ্চয় জানি। আকসিয়োনভরা তো রীতিমতো ধনী। তাদের বাপ অবশ্য সাইবেরিয়ায়, আমাদেরই মতন খুন-ডাকাতির দায়ে। আচ্ছা ঠাকুরদা, তুমি এখানে এলে কিভাবে?

আকসিয়োনভ তার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে চাইল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু বলল, পাপের ফল। পাপের ফলে আজ ছাব্বিশ বছর ধরে দণ্ড খাটছি এখানে।

'কী পাপ?' মাকার সেমিয়োনিচ জানতে চায়।

আকসিয়োনভ শুধু বলে, না না উচিত শাস্তিই হয়েছে আমার। আর কিছু সে বললে না। কিন্তু তার সঙ্গীরা নবাগতকে জানিয়ে দিল কিভাবে সে এখানে এসেছে। কিভাবে কেউ-একজন এক ব্যবসাদারকে খুন করে সে ছুরি গুঁজে দিয়েছিল আকসিয়োনভের ব্যাগের ভিতরে, তাইতে অন্যায়ভাবে তাকে চালান করা হয়েছে এই জেলে।

মাকার সেমিয়োনিচ শুনে হাঁটু চাপড়ে উঠল, আকসিয়োনভের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, চমৎকার! সত্যি চমৎকার! কিন্তু কত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি ঠাকুরদা!

অন্যেরা তাকে জিজ্ঞেস করে সে এত অবাক হল কেন! মাকার সেমিয়োনিচ তাদের কথায় উত্তর করল না। শুধু বলল, আশ্চর্য এই, যে এখানেই শেষ অবধি আমাদের দেখা হল?

তার কথায় আকসিয়োনভের ধন্দ লাগে, এ লোকটা কি তাহলে জানে কে খুন করেছিল সেই ব্যাপারীকে? সে বলল, সেমিয়োনিচ তুমি হয়তো শুনেছিলে ব্যাপারটা। হয়তো আগে আমায়ও কখনও দেখেছ। তাই না?

না শুনে থাকা যায়? দুনিয়া ছাপাছাপি হয়ে গিয়েছিল না গুজবে গুজবে। তবে অনেক দিন হয়ে গেল, আজ আর সব তত মনে নেই।

ব্যবসায়ীকে কে সত্যি মেরেছে, হয়তো তাও শুনেছিলে। তাই না?

মাকার সেমিয়োনিচ হাসল। বলল, যার ব্যাগে ছুরি মিলেছে অবশ্যই সে। যদি আর কেউ মেরে তার ছুরি সেখানে লুকিয়ে ফেলে— কথাতেই বলে ''যতক্ষণ না ধরা পড়ছে কেউ চোর না'', কিন্তু মাথার নীচে রাখা ব্যাগে বাইরের কে গিয়ে ছুরি ঢোকাতে পারবে? ঢোকাতে গেলে সে জেগে যাবে না?

কথাকটা শুনে আকসিয়োনভ এবারে স্থির নিশ্চয় হল যে এই সে লোক যে সেদিন খুন করেছিল ব্যবসায়ীকে। সে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। সেদিন সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না, ভয়ানক তার অস্থিরতা হতে লাগল, নানারকম কথা নানান পুরানো ছবি আসা-যাওয়া করতে লাগল মনে। মেলায় যাবার আগে বৌয়ের কাছে বিদায় নিচ্ছে— সে যেন তার সামনেই, তার মুখ, চোখ তুলে চেয়ে আছে তার দিকে, যেন কথা বলছে, হাসছে— সমস্ত দেখতে লাগল ফের সে চোখের ওপর। তারপর তার ছেলেমেয়েরা, খুব ছোট বাচ্চাটা, একজন জোব্বা চাপিয়ে দাঁড়িয়ে, আর একটা মায়ের বুকে লেগে আছে। নিজেকেও সে দেখতে লাগল— তরুণ বয়স, হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ— যেমন ছিল সে সময়ে। দেখল, সরাইখানার গাড়ি বারাদান্দায় বসে গিটার বাজাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে তাকে পাকড়াও করল। একেবারে ভাবনাচিন্তাহীন হালকা ফুর্তিবাজ একটা লোক। তারপর সেই জায়গাটা ভেসে উঠল যেখানে তাকে চাবুক মারা হচ্ছে— চারপাশে দাঁড়ানো লোক, আর তার ছেকলের ভার, আরো সব কয়েদীরা, তারপর জেলজীবনের পর পর ছাব্বিশটা বছর, আর তার অকালে বুড়িয়ে যাওয়া— পর পর সব ভেসে ভেসে উঠল একে একে—আর সব মিলে এত ভয়ানক হতাশায় তাকে ভরে তুলল যে নিজেকে মেরে আত্মঘাতী হবার জন্যে সে তৈরি হয়ে উঠল মনে মনে।

এই বদমাস লোকটারই তাহলে কাজ। এই বদমাসটা! মাকার সেমিয়োনিচের উপর তার ক্রোধ এত জ্বলন্ত হয়ে উঠল যে প্রতিশোধের জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। প্রাণপণ সে তখন প্রার্থনায় মন দিতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রার্থনার কথাকটা বলতে লাগল বারবার করে, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পেল না। সারাদিনে সে মাকার সেমিয়োনিচের কাছ ঘেঁষল না। এমন কি ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

এইভাবে এক পক্ষকাল কেটে গেল। রাতে ঘুমোতে পারে না আকসিয়োনভ, সারাদিন এত মুষড়ে আছে যে কী করবে ভেবে পায় না।

এক রাতে জেলের চারপাশে পায়চারি করছে অবিশ্রাম, হঠাৎ দেখে কয়েদীরা যেখানে ঘুমোয়— তাদের ঘুমোবার একটা তাকের নীচ দিয়ে একটু একটু করে মাটি বেরিয়ে আসছে— কী হয় দেখার জন্য সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ সেই তাকের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল মাকার সেমিয়োনিচ, আকসিয়োনভকে দেখে

কারণ ছাড়া তাঁর মৃত্যু হয়। কারনারভনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্জ গোল্ড বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্রুত মিশরে পৌঁছন। কায়রো ফেরার আগে তিনি কিংস ভ্যালির তুতানখামেনের সমাধিসৌধ দেখে আসেন। কিন্তু তাঁরও মৃত্যু ঘটে কায়রোতে ফিরে এক হোটেলে প্রবল জ্বরে। রেডিওলজিস্ট আর্চিবল্ড রেইড তুতানখামেনের বয়স ও মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে আধুনিকতম এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করেন। পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে তাঁরও মৃত্যু হয়। কারনারভনের ব্যক্তিগত সচিব রিচার্ড বেথেল তুতানখামেন আবিষ্কারের কিছুদিন পর ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ট-অ্যাটাকে মারা যান। তুতানখামেনের সমাধিসৌধ দর্শন করে ফেরার পর ব্রিটিশ শিল্পপতি জোয়েল উলের মৃত্যু হয় রহস্যজনক জ্বরে। এই মৃত্যুর ধারাবাহিকতাকে বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক শার্লক হোমস-এর স্রষ্টা আর্থার কোনাল ডয়েল অভিহিত করেন 'ফারাও-এর অভিশাপ' বলে।

সমাধি আবিষ্কারের ছ'বছরের মধ্যে সার্কোফ্যাগ্যাসেস খোলার সময় উপস্থিত টিমের ১২ জনের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী সাত বছরে মূল খননকার্যে যুক্ত দলের মাত্র দুজন বেঁচে ছিলেন। কারনারভনের সৎ-ভাই সমাধি প্রকোষ্ঠের দেওয়াল চিত্রে অর্ধশায়িত শৃগাল দেবতার ভয়ে উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। এছাড়াও কিংস ভ্যালির তুতানখামেন সমাধির খননকার্যে যুক্ত থাকা ২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু তথ্যও জানা গেছে। একমাত্র মূল নায়ক হাওয়ার্ড কার্টারের বৃদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে। তবে কার্টারের পোষা ক্যানারি পাখিটিকে প্রকোষ্ঠের মমির আশপাশে থাকা একটি গোখরো সাপ গিলে খায়। তবে এই ক্যানারি পাখির মৃত্যু নিয়েও আছে নানা জল্পনা-কল্পনার লতাপাতা।

মিশরের প্রত্নসম্পদ বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯৬৬ সালে তুতানখামেনের প্রত্নসম্পদ প্যারিসে প্রদর্শনে পাঠাতে আপত্তি করেন। কারণ তিনি নাকি স্বপ্নে নির্দেশ পান যদি প্যারিস প্রদর্শনীতে এইসব ফারাও শিল্প সামগ্রী পাঠানো হয় তাহলে ক্ষতি হবে। কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা না শুনে প্যারিসে পাঠান তুতানখামেনের প্রত্নসম্পদ। প্যারিস যাত্রার পরে রাস্তায় বেরিয়ে ইব্রাহিম পথ দুর্ঘটনাতে মারা যান।

১৯৬৯ সালে আবার তুতানখামেনের মমি রহস্যের অভিশাপের কথা উঠে আসে। ১৯২৩ সালের কার্টার টিমের অভিযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র কারনারভনের রক্ষী রিচার্ড অ্যাডামসন বেঁচেছিলেন। তিনি মমির অভিশাপ প্রসঙ্গে টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিদ্রূপ কটাক্ষ করেন। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। তাঁর ছেলে বিমান দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায়। তবু তিনি কটাক্ষ করে অভিশাপ প্রসঙ্গে অবিশ্বাস ব্যক্ত করে দ্বিতীয়বার টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এবারও স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পথদুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত দেহে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় অভিশাপের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশের ভুল স্বীকার করেন বৃদ্ধ রিচার্ড অ্যাডামসন।

এরপর আরেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে ১৯৭২ সালে। সেদিন মহম্মদ ইব্রাহিমের উত্তরসূরি প্রত্নবিভাগের ডিরেক্টর ডঃ গামাল মেহেরেজের হাতে দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিশেষ প্রদর্শনীতে তুতানখামেনের প্রত্ন সামগ্রী পাঠানোর। তাঁর পূর্বতন ডিরেক্টর মহম্মদ ইব্রাহিমের দুর্ঘটনাজনক মৃত্যুকে তিনি নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রদর্শনীতে প্রত্নসামগ্রী প্লেনে তুলে দেওয়ার পরের দিনেই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মেহেরেজের মৃত্যুই শুধু ঘটে না, যে বিমান তুতানখামেনের প্রত্নসামগ্রী বহন করেছিল তার যাত্রীদেরও নানা আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি ঘটনা মমি রহস্যের দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিমানের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার ইয়ান ল্যান্সডাউন লন্ডনে পৌঁছনোর আগে দাম্ভিকতায় মমির মুখোশবহনকারী পেটিকাতে পা দিয়ে মন্তব্য করেন— 'আমি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রীতে পা রাখতে পেরেছি।' ঠিক বিমান থেকে নামার সময় রহস্যজনকভাবে তিনি সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যান। আজীবন তাঁকে খোড়া পা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

এইসব মৃত্যুরহস্যের যবনিকা উন্মোচন করতে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়েছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় তত্ত্ববিষয়ক গবেষক জেনিফার ওয়েগনারের মতে সমাধিসৌধের প্রকোষ্ঠে শুধু মমি নয়, মৃতদেহের সঙ্গে অনেক খাদ্য দ্রব্যও রাখা থাকত আত্মার তৃপ্তির জন্য। মাংস, সবজি প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে শুধু পোকামাকড় নয়, ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের সৃষ্টি হয়ে এক ভয়াবহ মৃত্যুর আবহ সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়া পরীক্ষায় দু-প্রকার ছত্রাকের সন্ধান মিলেছে। হাজার হাজার বছরের খাদ্যসামগ্রী এক বিশেষ ধরণের মারাত্মক বিষমণ্ডের সৃষ্টি করেছিল। তাই তার সংস্পর্শে আসলেই মানুষের মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু প্রশ্ন, যারা এই প্রকোষ্ঠে কখনই ঢোকেনি কিংবা দূরে থেকে 'ফারাও অভিশাপে' প্রাণ দিয়েছিল তাদের মৃত্যুরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

তবে মিশরীয় পদ্ধতিতে সমাধিসৌধ সৃষ্টিতে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিরোধসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া যে অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনস্বীকার্য। বাদুড়-চামচিকার বর্জ্যের ওপর যে ছত্রাক জন্মায় তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো শ্বাসনালীর রোগ হিস্টোপ্লাজামোসিস ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তা হল কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে এক মারাত্মক অজানা জ্বরে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। রোগের সংক্রমণ এমন ভয়াবহ হয়েছিল যাতে চিকিৎসক পর্যন্ত রোগীর সান্নিধ্যে এসে আক্রান্ত হয়। হাসপাতালকর্মীরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। পরে দিল্লির একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসে অনুসন্ধানে জানান শিলিগুড়ির কাছে একটি বাদুড়ের আস্তানা থেকে এই জ্বরের উদ্ভব। তাহলে হাজার বছরের আগেও মিশরের সমাধিসৌধের প্রকোষ্ঠে বাদুড় ও

বীর কোমলু

বলরাম বসাক

রাঙাদের কোমলুকে কেউ কেউ ডাকে কম্বল। ক্যামলা বলেও ডাকে কেউ কেউ। রাঙাও ডেকে ফেলেছে। মোটে তিনবার। ডেকে খুব করে হেসে ফেলেছে। আর ঝুনঝুনি? সেও ওকে আটবার ডেকেছে। 'কম্বল' বলে ডেকেছে চারবার। 'ক্যামলা' বলে ডেকেছে চারবার। ডেকেই প্রত্যেকবার হি হি করে হেসেছে। কিস্‌কুদা, অঘ্‌ঘদা সোহিনী পিসি পিনকি দিদি— ওরাও অনেক অনেকবার ডেকেছে।

এবার থেকে রাঙা-ঝুনঝুনিদের সবাই কোমলু বলেই ডাকবে। কারণ কোমলু না বললে জেঠুমণি কান ধরে ওঠবোস করায়— কাউকে দশবার কাউকে বিশবার কাউকে তিরিশ। জেঠুমণির কাছে কোমলুটা ওই সময় একেবারে 'গুডি গুডি বয়' হয়ে থাকে। কিন্তু জেঠুমণির আড়ালে রাঙার দিকে জিভ ভ্যাংচায়। ঝুনঝুনির দিকেও জিভ ভেংচিয়ে ছিল আটবার।

এই হচ্ছে চোখ-পিটপিটে কোমলু।

এ-হেন কোমলু কী একটা বই পড়ে আচমকা ঘোষণা করে বসল, ''আমি বীর হব। বীর। বীর রাণাপ্রতাপ সিংহ।' বলতে বলতেই তাড়াতাড়ি পিচবোর্ড কেটে না-তলোয়ার না-খাঁড়া কী অদ্ভুত দেখতে একখানা কাটারি মতন অস্ত্র বানাল। তাই দিয়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং ঘ্যাচ করে বেশ কয়েকটা মাথা কেটে ফেলল। মাথা নয়। ব্যাঙের ছাতা।

ওগুলো যে ব্যাঙের ছাতা, রাঙা কিন্তু প্রথমে একটুও বুঝতে পারেনি। কী বড় বড়, এক-একটা, উল্টানো বাটির মতো দেখতে।

ব্যাঙের ছাতাগুলো পুকুরপাড়ে তালগাছের তলায় গজিয়ে ছিল। কোমলুর বীরত্বে অতগুলো ব্যাঙের ছাতা ওরকম ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে। একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তালগাছতলা।

তার ওপর দু-একটা ফুলসুদ্ধ কেশরবতীর চারাগাছ, গোলমরিচের মতো খুদে খুদে নীল ফুলের ছোট ছোট জঙ্গুলে চারাগাছগুলো একেবারে সাফ। ওই খুদে নীল ফুলগুলো কুচো কুচো হলদে প্রজাপতিদের বেশ লাগত। তাই বুঝি তাদের রাগ হয়েছে। রাগে গরগর করছে। না-তলোয়ার সেই কাটারি হাতে কোমলুর দৈত্যিপনার জন্য রাগ হওয়ারই কথা। আমি হলে, আমি তো খুব-খুব-খুবই রাগ করতাম। অবশ্যি এক ঝাঁক ওই রকম কুচো কুচো হলদে প্রজাপতির পিনফুটোর মতো চোখগুলোতে কোমলুকে একটা বিশাল স্বার্থপর দৈত্য মনে হয়েছে। সেই জন্যই ওরা ওদের নীলফুলের বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তারপর ওইখানটায় রোদ পড়তেই ছোট্ট একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল এক বিঘত মাপের একটা কেঁচো কিলবিল কিলবিল... কী মুশকিল কী মুশকিল। বেশ তো এখানটায় একটা মিষ্টি ছায়া ছিল, ব্যাঙের ছাতায় ছাতায় ঢাকা। শিশির শুকোতো অনেক দেরিতে, অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখত মাটি। সেই ভেজা নরম মাটির তলায় তোফা ঘুম দিত ওই কেঁচো। বড্ড পরিশ্রম হয় তো, তলার মাটি ওপরে উপড়ে দিতে। ওটাই তো কাজ। কিন্তু হঠাৎ কেন এদিকটায় রোদ এসে পড়ায় ঝিলমিল— কী মুশকিল কী মুশকিল। আহা-হা একরাশ ছাতা ঢাকা ছায়াগুলো গেল কোথায়? মুখ উঁচিয়ে চারদিকটা দেখতে থাকে কেঁচো। এ কী ফ্যাচাং। ছাতাগুলো কে কাটল ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং...। শিশির ফোঁটা শুকিয়ে আসা খুদে নীল ফুলগুলো আর তাকাতে পারছে না। তারা মাটিতে নেতিয়ে পড়ে আছে এদিকে-ওদিকে।

কেঁচো এখন কোথায় যায়। থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে ছোট্ট ছেলে রাঙা তাকিয়ে থাকে কেঁচোটার দিকে। চোখ মেলে রাখে স্থির। যেখানটায় ওর বাসা, রোদে সেখানটা আর ভেজা ভেজা থাকে? শুকনো হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার টুকরোগুলোও শুকিয়ে যাবে। ওগুলোর তলায় তলায় আর থাকা যাবে না। ওইগুলো দিয়ে কেঁচো রোদ ঠেকাতেও পারবে না। রোদে বড় কষ্ট কেঁচোটার।

হলদে হলদে প্রজাপতিরা রাগে ফরফর করে চলে গেছে। কেঁচোটাও বড় দুঃখে সড়সড় করে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। কোথায় গেল প্রজাপতিরা? জেঠুর কাছে নালিশ করতে? বেশ হয় যদি ওরা নালিশ করে। জেঠু দেখুন কোমলুর দুষ্টুমি। ও নাকি 'গুডি গুড়ি বয়', সবাই নাকি বলে।

হলদে প্রজাপতিরা ফরফর করে উড়তে উড়তে বারান্দা পর্যন্ত এসেছিল। বারান্দায় তখন জেঠু গোল গোল ভারী কাচের চশমা পরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খুব মন দিয়ে জেঠু পড়া করেন তো তাই ওই সময় তাঁকে বিরক্ত করতে নেই। খুব বুঝদার কুচো হলদে প্রজাপতিরা; তক্ষুনি নালিশ না জানিয়ে কাছেই উঠোনে গাঁদা ফুলগাছের থরে থরে হলদে ফুলের ওপর বসল। কত্ত রকম হলদে গাঁদাফুল। সাদা হলদে, বাসন্তী হলদে, কড়া হলদে, কমলা হলদে, লালচে হলদে, সব রকম হলদে রঙের গাঁদাফুলগুলো থরে থরে নড়েচড়ে হাসছে হলদে প্রজাপতিদের পেয়ে। প্রজাপতিরা নড়েচড়ে বসেই রইল স্থির হয়ে, 'দাঁড়া, জেঠুর কাগজ পড়া শেষ হোক। তারপর কোমলুর বীরত্ব দেখানো বের করছি।' ভাবছে বোধ হয় প্রজাপতিরা।

আর ওদিকে কেঁচোটা কী করল। সে কিন্তু ভলোই জানে কোমলুর কীর্তি। সে খুউব মনমরা হয়ে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে এঁকে বেঁকে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে থমকে যায়। কাছাকাছি কোনও কাক বক হাঁসটাস মাটি দাপাচ্ছে কি না মাটি কাঁপলেই কেঁচো টের পায় নিশ্চয় কাছাকাছি কোনও বিপদ। কিছুক্ষণ শুকনো কলমি

ডাঁটার মতো পড়ে থাকে। যখন বুঝতে পারে মাটিতে আর দাপাদাপি হচ্ছে না, তার মানে কাছাকাছি কাগাবগাটগা নেই, তখনই আবার চলতে শুরু করে।

এমনি করে চলতে চলতে দেখা হয়ে গেল কেঁচোর সঙ্গে খয়েরি রঙের শামুকের। 'কোথায় চললে কেঁচোদাদা,' শুঁড় তুলে বলল শামুক।

রাঙা চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে পা টিপেটিপে চলছিল কেঁচোটার পিছুপিছু। হঠাৎ পায়ের চাপে একটা নুড়ি নড়ে উঠেছিল। তাতে কেঁচোটা একটু থমকে গেছিল। আর শব্দ হচ্ছে না দেখে একটু নড়েচড়ে উঠল, বলল শামুককে, 'কোথায় আর যাব? একটা বেশ ভেজা জবজবে নরম মাটি খুঁজছি। বেশ ছায়া ঢাকা। পেলে সেখানে গর্ত করে বাসা বানাব।' তারপর মুখটা একটুখানি তুলে বলল, 'তুমি কোথায় চললে ভাই...।'

'বাজারে গেসলুম। এই তো বাসায় ফিরছি।' বলল শামুক। তার ঘাড়ে একটা কড়াইশুঁটির আধখানা দানা লেপটে আছে। গাজরের চিলতেও একটুখানি লেপটে আছে পিঠে খোলের গায়ে। একটা এইটুকুনি ধনেপাতাও লেগে আছে পাশটিতে।

'অনেক বাজার করেছ দেখছি।' বলল কেঁচো।

'বাজারে কী দাম কেঁচোদাদা।' শুঁড় উঁচিয়ে নেড়েচেড়ে বলল শামুক, 'একটা দানার দাম এক টা-কা?' তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে শশার একটা বিচির দাম কত হয়ে গেল বলতে পারো?'

'তাই তো ভাই,' বলল কেঁচো কাচুমাচু হয়ে। 'দিনকাল বড্ড খারাপ। কোথা থেকে কে এসে সবকটা ব্যাঙের ছাতা কেটে দিলে গা। এতকালের ছায়া হাপিজ করে দিলে? রোদ ছড়িয়ে দিয়ে আমার থাকার জায়গাটা দিল ভেস্তে। এখন কোথায় যাই বলো দিকিনি...?'

'তুমি আমাদের ওখানটায় চলে এসো না।' বলল শামুক।

'কোনখানটায়?'

'ওই যে আমাদের বাসা যেখানটায়। গাঁদাফুলগাছের তলায়। ওই তো কাছেই। চলে এসো, চলে এসো। ওখানে গাছতলায় সব সময় ছায়া আর রোজ সকালে বিকেলে জল পড়ে বলে মাটি সবসময় ভেজা-ভেজা।'

জেঠুর বারান্দার ধারে উঠোনে গাঁদাফুলগাছগুলোর তলায় শামুকের কেঁচোদাদা শামুকের পিছু পিছু চলে এল। তখন দুপুর শুরু হয়ে গেছে।

ওদিকে কোমলুটা মাঝে মাঝেই কী একটা বই পড়ছে পাতা উল্টে উল্টে। তারপর থেকে থেকে দালানে ছুটে এসে সেই অদ্ভুত কাটারির মতন তলোয়ারটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'আমি বীর অমুক'...'আমি বীর তমুক...।'

উঠোন থেকে রাঙা যখন ভেতরে ঢুকছিল, দুপুর হয়েছে তো, চান করবে, খাবে, তখন কোমলুটা তার আজব তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছিল, 'বাংলা বিহার ওড়িশার নবাব আমি...' হঠাৎ রাঙার দিকে তেড়ে ছুটে গেল তলোয়ার নিয়ে, 'মীরজাফর তুমি কী বিশ্বাসঘাতক?'

রাঙা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কোমলুর তলোয়ার নিয়ে দাপাদাপি বড্ড বেড়ে যাচ্ছে দেখে ফস করে বলে ফেলল, 'তুই, তুই বিশ্বাসঘাতক। একটা স্বার্থপর দৈত্য তুই... তোর জ্বালায় কেঁচো শামুক হলদে প্রজাপতিরা...।'



ঠিক তখুনি ঝুনঝুনি ছুটে এসে রাঙাকে টেনে নিয়ে অন্যখানে সরিয়ে দেয়। নইলে হয়তো মারপিটই বেধে যেত।

যাই হোক রাঙার কিন্তু ভালো লাগেনি কোমলুর এই আস্ফালন। তাই সে ঠিক করল দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ওর পিচবোর্ডের আজব তলোয়ারটা চুপি চুপি হাতিয়ে নেবে।

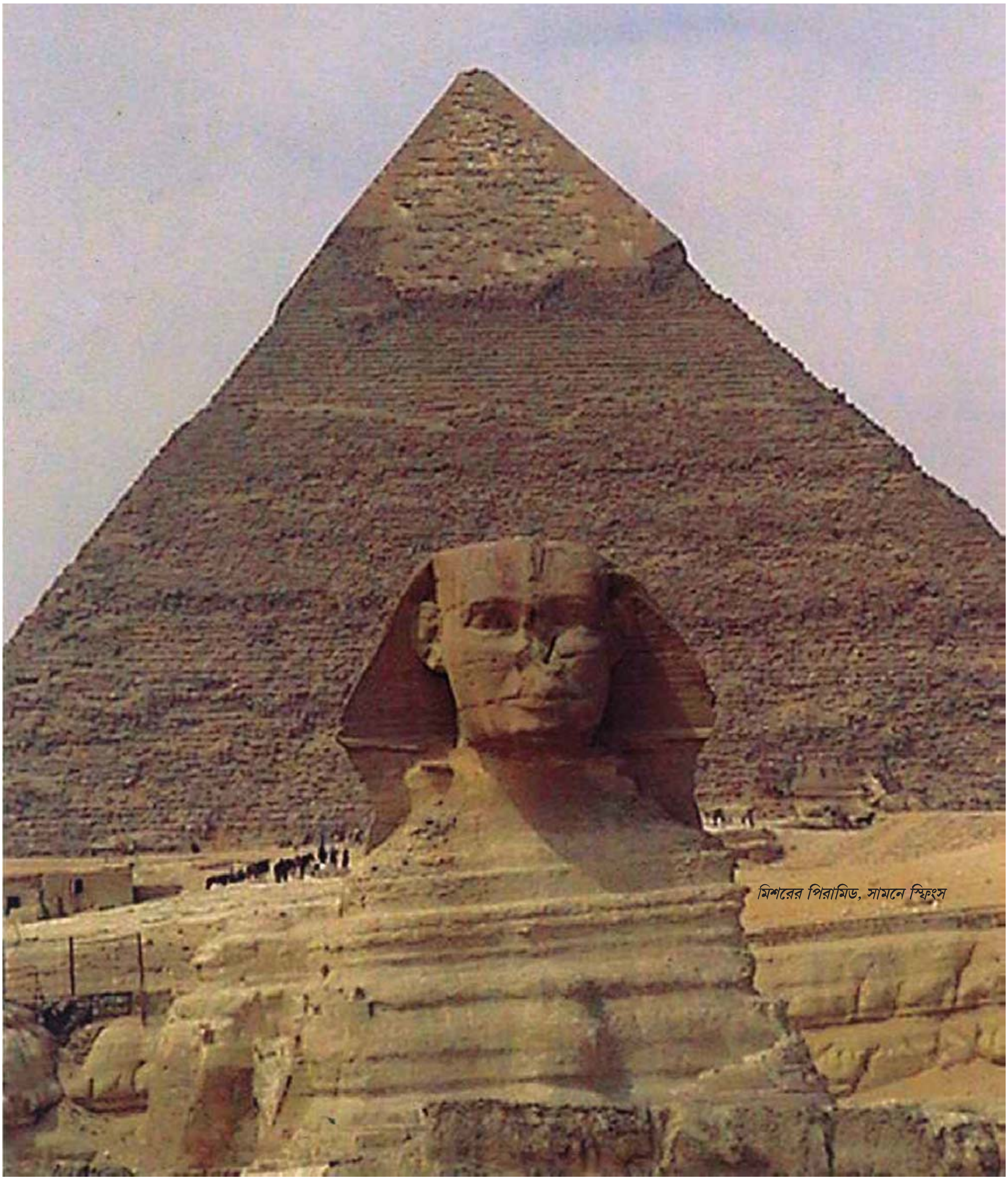
ছুটির দিন। খাওয়া-দাওয়া সারতে দুটো বেজে গেল। তার পনেরো মিনিট আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে রাঙা সেই তলোয়ারটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। কোথাও পেল না। কোথায় যে ওটা লুকিয়ে রেখে দিল কোমলু। কিন্তু ঝুনঝুনি করল কী, কোমলুর পড়ার টেবিলে একটা বই খুলে একটা পদ্য বের করে রেখে এল। কী পদ্য সেটা আর রাঙা দেখবার সময় পেল না। কোমলুটা সে-ঘরে তখন এসে পড়বে-পড়বে। ওর এসে পড়ার আগেই ঝুনঝুনি রাঙাকে টেনে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। কোমলুও তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকল।

একটু পরে...। কতক্ষণ পরে? এই মাত্তর আধঘণ্টা পরে, ফের সেই কাটারি মতন আজব তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে কোমলু এবারে বেশ জোরে জোরে মানে কানফাটা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার। টুকরো করে দেব তোদের মেরে। হা রে রে রে রে রে হা রে রে রে রে রে...' শেষের হা রে রে রে-টা এমন জোরে চিৎকার করে করল কোমলুটা জেঠুর গেল দুপুরের ঘুম ভেঙে। আর কোমলু গুড়ি গুড়ি বয় থাকল না। কান ধরে উঠবোস করল তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ...।

তাই দেখে অঘ্ঘদা সোহিনী পিসিরা আড়ালে হেসে দিয়েছে। কিন্তু কাছে দাঁড়ানো রাঙা ঝুনঝুনিরা মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। হাসবে কী করে জেঠুর সামনে? তবে গাঁদাফুলগুলো খুব হেসেছে বারান্দার ওপারে। নানারকম হলদে ফুলের ওপর কুচো কুচো হলদে প্রজাপতিরাও খুব খুশি। ছুটে এসে দেখল রাঙা গাঁদাফুলগাছের তলায় শামুক কেঁচোরা খুশি হয়েছে কিনা। শামুক তো তখন গাজরের চিলতে, আধখানা কড়াইশুঁটির দানা আর ধনেপাতার ছোট পাতা দিয়ে একটা খাসা সুপ বানাচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে। আর কেঁচোদাদা, সে তখন তলার মাটি ওপরে তুলে অনেক পরিশ্রম করে গর্ত বানিয়ে তার ভেতরে একটা ঘুম দিচ্ছিল তোফা। পরম নিশ্চিন্তে। তাই দেখে রাঙাও নিশ্চিন্তে তাকায় চোখজুড়ানো ছায়ার দিকে, সোনালি ফুল প্রজাপতির দিকে, ঝিলমিল পুকুরের দিকে, তারপর তালগাছের মাথায় আকাশের দিকে।

তুতানখামেনের মমি রহস্য

লেখা: সুব্রত রাহা ছবি সংযোজন: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী



মিশরের পিরামিড, সামনে স্ফিংস

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার দেশ, রহস্যের ঘেরাটোপে ঘুমিয়ে থাকা মিশর। রাজরক্তের কত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা জিঘাংসা গুপ্তকথার ফিসফিসানি ঊষর বালুঝড়ে শোনা যাবে। মিশরের বিখ্যাত রাজপুরুষের সমাধিভূমি কিংস ভ্যালিতে প্রায় মাটি কামড়ে ছয় বছর পড়েছিলেন পুরাতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার তুতানখামেনের সমাধির সন্ধানে। সঙ্গী সাথী যখন প্রায় শাবল গাঁইতি চালিয়ে হতাশ, মনে অবসাদ এক ব্যর্থ অভিযানের গ্লানিতে, ঠিক তখনই এক শীতের অপরাহ্ণে শ্রমিকেরা চিৎকার করে ওঠে খোড়াখুঁড়ি থামিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের সিঁড়ি দেখা গেছে। কিন্তু সেদিনের মতো কাজ থামিয়ে যে যার তাঁবুতে ফিরেছিল পরের দিনের প্রত্যাশায়। কারণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আর কাজ করা যাবে না।

তারপর দীর্ঘদিন ধরে খননকার্য চলে, তুতানখামেনের মমির সন্ধানে। ১৯০৫ সাল থেকে প্রাচীন মিশরের লোকগাথা, লোকশ্রুতির কুহেলিতে ঢাকা কিশোর ফারাও তুতানখামেনের কবর অনুসন্ধানে কার্টার ও তাঁর প্রেরণাদাতা পঞ্চম আর্ল অব কারনার ভন (প্রকৃত নাম জর্জ হার্বার্ট) এবং কিছু সঙ্গী সাথী প্রায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ১৯২২ সালের ২৬ নভেম্বর সারা বিশ্ববাসীর কাছে কার্টার উন্মোচন করলেন মৃত্যু রহস্যে ঢাকা তুতানখামেনের কবর। সেখানে অতুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত সোনার মুখোশে কিশোর তুতানখামেনের মমি দীর্ঘকাল গুপ্ত আছে। মমি রহস্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল, হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু, কে এই তুতানখামেন? —এসব প্রশ্নও উঠে এসেছিল।

তুতানখামেনের সমাধিতে পাওয়া তাঁর সিংহাসন, কায়রো মিউজিয়াম





তুতানখামেনের তিনপ্রস্থ কফিন-ঢাকনার একটি। সমাধিতে পাওয়া। কায়রো মিউজিয়াম

কার্টার তড়িঘড়ি মমিটি কাটাছেঁড়া করে ঘোষণা করলেন মমিটির মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। রহস্যের জাল ঘন প্রসারিত হল। কার্টারের তুতানখামেনের মমি আবিষ্কারের ৮৫ বছর পর কিশোর ফারাও-এর মৃত্যুরহস্য জানার কৌতূহল এখনও অম্লান। কী হয়েছিল কিশোর-রাজকুমার তুতানখামেনের? কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল? ২০০৭-এর নভেম্বর মাসে মিশরের জাতীয় পুরাসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে যুক্ত সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান জাহি হাওয়াস সরকারিভাবে আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন তুতানখামেনের মুখ। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে তোলা হল ১৭,০০০ ছবি। সরকারি মুখপাত্র জানালেন কোনও অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি মৃত্যুর কারণ হিসেবে।

মিশরের অষ্টাদশ সাম্রাজ্যের দ্বাদশ শাসক ছিলেন তুতানখামেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১৩৩৪ থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মিশরের রাজকাহিনীতে তুতানখামেনের নাম চাপা ফিসফিসানিতে শোনা গেলেও কারা যেন কিংস ভ্যালিতে সযত্নে তাঁর সব স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিতে চেয়েছিল। তাই প্রাচীনকাল থেকে তুতানখামেনের অনুসন্ধান হয়ে উঠেছিল রহস্য-ঘেরা এক দুঃসাহসিক অভিযান। কিংস ভ্যালির এক উপেক্ষিত সমাধিসৌধ।

ফারাও তুতানখামেনের বিয়োগান্ত জীবনকাহিনীর সূত্রানুসন্ধানে গিয়ে পৌঁছতে হবে অষ্টাদশ সাম্রাজ্যের নবম সম্রাট তৃতীয় আমেনহোটেপের রাজত্বকালে। এই

আমেনহোটেপের সময় বহু দেবদেবীর উপাসক মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক 'কালচারাল রেভিলিউশন' ঘটে গেল। সূর্যদেবতা আটেনকে মিশরের প্রবল ক্ষমতাশালী আমেন-রে (আমুন) পুরোহিত সম্প্রদায়েরও ঊর্ধ্বে বসাতে চেষ্টা করেন আমেনহোটেপ। সিংহাসনে বসে তিনি সমস্ত দেবদেবীর উপাসনাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সামাজিক এই পালাবদলের সময় এক ধূর্ত ক্ষমতালোভী সেনাবাহিনীর প্রধান পদে ক্ষমতা দখল করেন। এঁর নাম হোরেমহেব, তুতানখামেনের জীবনের ট্র্যাজেডির প্রধান নেপথ্যের খলনায়ক।

প্রাচীন মিশরের সামাজিক বিধান অনুসারে সম্রাটের মেয়েই রাজরক্তের ধারক ও উত্তরাধিকারিণী। তাঁকে যিনি বিয়ে করেন তিনিই মিশরের পুরোহিত-সম্রাট, ফারাও। তুতানখামেনের জন্মপরিচয় কিছুটা গোপন করে সম্পর্কে তাঁর বয়সে বড় সৎ বোন রাজকুমারী আঙ্খেসাটেনের সঙ্গে বিয়ে হয়। মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সি ফারাও এলেন ৯ বছরের তুতানখামেন। সুন্দরী আঙ্খেসাটেনের ভালোবাসার স্মারক সমাধিসৌধে বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সোনার তৈরি সূর্যদেবতার চাকতিতে মুদ্রিত আছে কিশোর স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর ছবি।

এছাড়া তুতানখামেনের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে অনেকে একসময় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিংস ভ্যালিতে তুতানখামেনের সমাধিসৌধটি রাজকীয় মর্যাদার না বলে পুরাতত্ত্ববিদ জিওভাসি বেলজোনি প্রমাণ করেছেন। আগে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল তুতানখামেনের মৃত্যু হয় রাজরোগে অর্থাৎ যক্ষ্মাতে। কিন্তু হাড়ের পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে তিনি ছিলেন সুস্থদেহী এক কিশোর। কার্টারের পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় এক চমকপ্রদ তথ্য। মমির ঊর্ধ্ব মস্তিষ্কের গহ্বরে এক লম্বালম্বি চিড় খাওয়া হাড়ের টুকরো পাওয়া গেছে। এর দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করা যায়। এক, কোনও দুর্ঘটনা। দুই, হত্যার চেষ্টা। থুতনির তলায় জোরাল কোনও আঘাত (ঘুঁসি) লাগলে এমনভাবে হারের টুকরো ছিটকে যেতে পারে মস্তিষ্কের দিকে। এছাড়া বাঁ-ঊরুর কাছে হাড় ভেঙে যাওয়ার চিহ্ন বর্তমান। এতগুলি আঘাত লাগার কারণ কী?

২০০৫ সালে প্রথম সিটি স্ক্যানে তুতানখামেনের শরীর মেশিনের তলায় রাখা হয় মখমলের ব্যান্ডেজ খুলে। ঠিক সেই সময় সমগ্র মিশর একঘণ্টা অন্ধকারে ডুবে থাকে। তখন যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা হল, কিশোর ফারাও-এর মৃত্যুর সময় উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫-৬ ইঞ্চি। শিরদাঁড়া সামান্য বাঁকা, বিশেষজ্ঞদের ধারণা মমি প্রস্তুত করার সময় মলম লাগাতে গিয়ে বেঁকে যেতে পারে। মমি তৈরির সময় নাকের ফুটো দিয়ে মস্তিষ্কের ভেতরের পদার্থসমূহ বার করে নেওয়া হয়। আর পিঠের দিকে ফুটো করে পেটের অন্ত্রাদি বার করা হয়।

গবেষক জাহি হাওয়াস মনে করেন হয়তো শিকার করতে গিয়ে কিংবা রথ থেকে পড়ে কিশোর তুতানখামেনের পায়ে আঘাত লাগতে পারে। পায়ের আঘাত খোলা থাকার জন্য হয়তো গ্যাংগ্রিন হতে পারে এবং তাতেই কিশোর ফারাও-এর মৃত্যু হয়। তুতানখামেনের জীবনের বিয়োগাত্মক ঘটনা সম্পর্কে নানা অনুমান ও কল্পনার মধ্যে কিশোর ফারাও যে কোনও দুষ্ট চক্রান্তের শিকার হয়ে সম্রাটের সিংহাসনভ্রষ্ট হন একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর কিংস ভ্যালিতেও তিনি রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেননি, একথা আগেই বিশেষজ্ঞদের মতামতে উল্লেখ করেছি।

তুতানখামেনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা যুবতী স্ত্রী আঙ্খেসাটেনের চারপাশে ঘিরে থাকা রাজপুরুষদের মধ্যে সম্রাজ্ঞীকে লাভ করার এক অসম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথানুযায়ী মমি তৈরির ৭০ দিন ব্যাপী সময়ের মধ্যে রানি যদি কাউকে স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করেন, তাহলে তিনিই হবেন মিশরের পরবর্তী পুরোহিত-সম্রাট নতুন ফারাও। ক্ষমতালোভী কুচক্রী সেনাপ্রধান হেরমহেব মিশরের সম্রাজ্ঞীর দিকে হাত বাড়ালেন। অল্পদিনের মধ্যে হেরমহেব রানি ও সিংহাসনের দখল নিয়ে দ্রুতপদে তুতানখামেনের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন ও নাম রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে মুছে ফেলতে উঠে-পড়ে লেগে যান। কিশোর তুতানখামেনের নাম খুব শক্ত হাতে মুছে দিতে গিয়ে হেরমহেব নিজেই মুছে গেছেন ইতিহাসের যবনিকার আড়ালে। কিন্তু প্রাচীন তিন হাজার বছরের মিশরের ধর্মীয় ইতিহাসের এক সংকটময় অধ্যায় কিশোর তুতানখামেন, আজও তাঁর জীবনকাহিনী ও মমি প্রসঙ্গে কৌতূহলের চুম্বককেন্দ্রে অবস্থান করছে।

কায়রোর জাদুঘরে অসংখ্য পর্যটকের চোখের সামনে কাচের বাক্সে রাখা আছে তুতানখামেনের দেহ। রাজবংশের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে উঁচু দাঁতে হাস্যোজ্জ্বল মুখ কিশোর ফারাও-এর। জাহি হাওয়াস বলেছেন, 'আমরা শেষ অবধি সোনার ছেলে বালক ফারাওকে হাসতে দেখলাম।'

ফারাও-এর অভিশাপ: মৃত্যু-ধারাবাহিকতা

তুতানখামেনের কবর ও মমি অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশের জীবনে দুর্ঘটনা ও অদৃশ্য মৃত্যুর এক ধারাবাহিক রহস্যজাল— যা আজও কেউ ভেদ করতে পারেনি। যার তেমন কোনও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি। ষোলটি সিঁড়ি অতিক্রম করে এসে থমকে দাঁড়ালেন পুরাতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ও তাঁর সঙ্গীরা। কোষাগারের মাথার ওপর যে হুঁশিয়ারির ঘোষণা তা দেখে চক্ষুস্থির। কারণ কবরগুলো ছিল সোনা ও মূল্যবান ধাতুরত্নের কোষাগার। মিশরীয় সভ্যতার বিশ্বাস অনুসারে মৃতের সঙ্গে মূল্যবান দ্রব্য এমনকি খাদ্যবস্তু মমির প্রকোষ্ঠে রেখে দেওয়া হত। হিয়েরোগ্লিয়েফ লেখা:

'আমি সেই প্রহরী যে গুপ্ত প্রকোষ্ঠকে বালুকাস্রোতে ডুবিয়ে দেওয়া থেকে প্রতিহত করি। আমি মৃতদের অস্তিত্ব রক্ষায় সদা জাগ্রত প্রহরী।'

এছাড়া আরও এক ভয়াবহ সাবধান বাণী—

'মহান সম্রাটদের পবিত্র সমাধিসৌধের চৌকাঠ পার হওয়ার দুঃসাহস দেখাবে যারা তাদের সবাইকে হত্যার অঙ্গীকার করছি।'

মিশরের ঊনবিংশ সাম্রাজ্য প্রারম্ভকালে তুতানখামেনের সমাধিতে বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয় গুপ্ত মূল্যবান রত্ন ও সোনা প্রভৃতি ধাতুর লোভে। ফটকে ঝোলানো দড়ি বাঁধা অর্গল ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রকোষ্ঠে ছড়ানো-ছিটানো থেকে ডাকাতির প্রচেষ্টা প্রমাণ হয়েছে। তবে ডাকাতরা সকলেই বালির ঝড়ে সম্পদ নিয়ে পালাতে না পেরে বালিতেই সমাধিস্থ হয়েছে। কারও কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

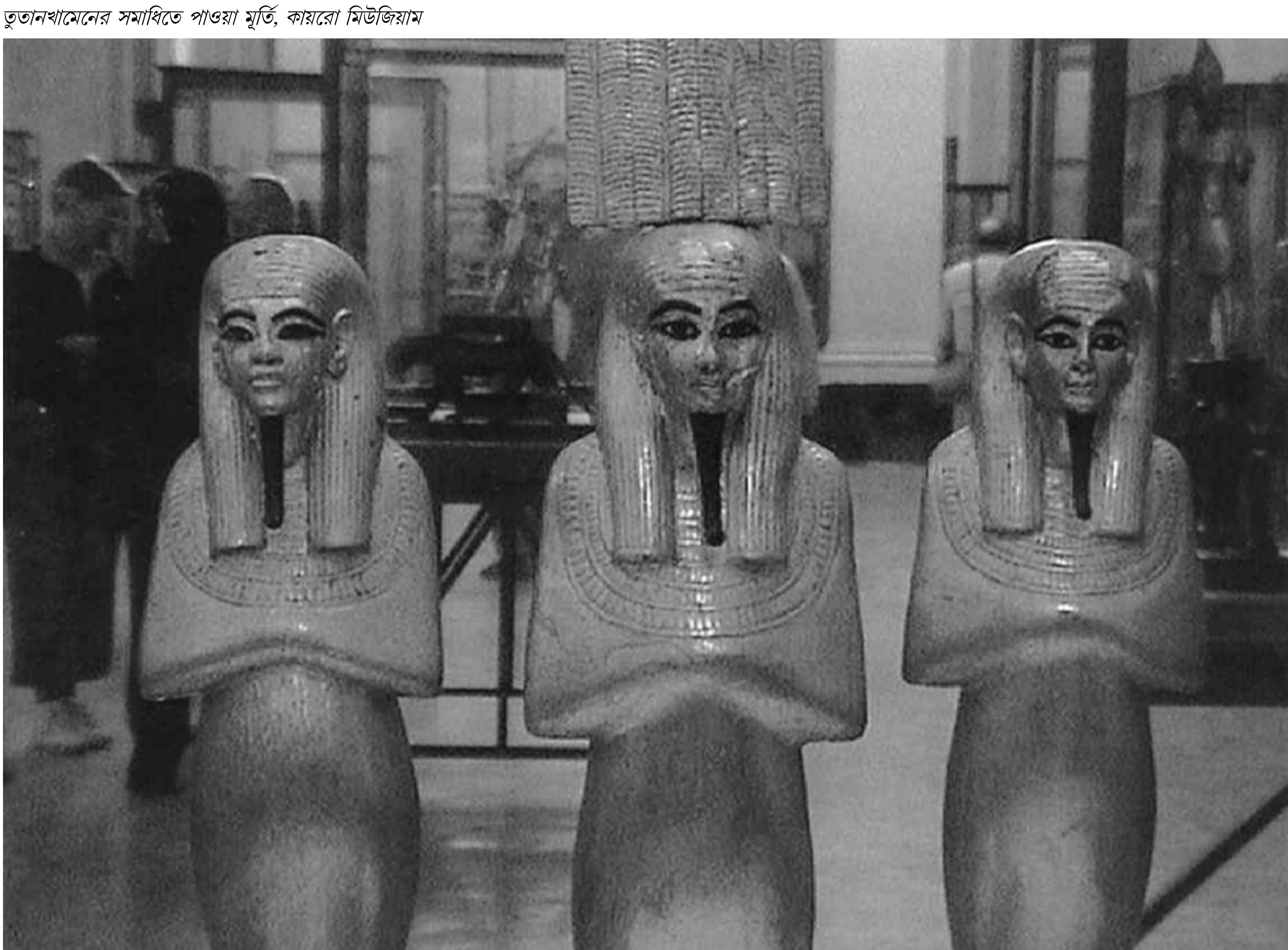
১৯২৩ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি তিন হাজার বছর পর তুতানখামেনের সমাধির মূল প্রকোষ্ঠের সিলমোহর ও দরজা ভাঙেন কার্টার ও লর্ড কারনারভন। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কার্টারের চোখ প্রায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে যায়। সোনা মণি রত্নের অতুল বিভূতি। আর তাঁর সঙ্গী লর্ড কারনারভনের চোখে পড়ে মমির মাথার কাছে হিয়েরোগ্লিফে লেখা চরম হুঁশিয়ারি—

‘ফারাওদের শান্তিপূর্ণ চিরনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাবে যারা তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।’

চিরকাঙ্খিত তুতানখামেনের গুপ্ত সমাধি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাকি শুরু হয় ফারাওদের অভিশাপের প্রতিশোধের লীলা। কারনারভন যখন ইংল্যান্ড থেকে মিশরের এই দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে ছিলেন তখন তাঁকে বিখ্যাত মরসিক কাউন্ট হ্যামন নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ফারাওদের নিষেধ অমান্য করলে মৃত্যু ডেকে আনবে মিশরের মাটিতে।’ কিন্তু কারনারভন সে নিষেধ অমান্য করেছিলেন। তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করার আগেই ৪৭ দিনের মাথায় ১৯২৩ সালের ৫ এপ্রিল এক সংক্রমণবাহী মশার কামড়ে কায়রোর কন্টিনেন্টাল হোটেলের এক ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সারা শহরের আলো নাকি হঠাৎ নিভে যায়। এছাড়া হাজার হাজার মাইল দূরে ইংল্যান্ডে তাঁর বাড়িতে এই অশুভ শক্তির প্রভাব পৌঁছয়। কারনারভনের কাউন্টি হাউসে তাঁর পোষা কুকুর সারারাত হাড়হিম করা আর্ত চিৎকারে ছটফট করে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। কারনারভনের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে কাগজের রিপোর্টারদের অনুসন্ধান শুরু হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যায় কারনারভনের মৃত্যুর দু-দিন পরে তুতানখামেনের মমিটি পরীক্ষা করে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখা যায়। মমির বাঁদিকের গালে এক অদ্ভুত দাগ। ঠিক সেই স্থানে কারনারভনকে মশাটি কামড়ে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে। এই ঘটনার সাদৃশ্যকে একেবারে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরপর কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা পর পর ঘটে, যার রহস্য আজও ভেদ করা যায়নি।

কারনারভনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আরেক প্রত্নতাত্ত্বিক আর্থার মেস কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কোনও যুক্তিগ্রাহ্য

তুতানখামেনের সমাধিতে পাওয়া মূর্তি, কায়রো মিউজিয়াম



কারণ ছাড়া তাঁর মৃত্যু হয়। কারনারভনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্জ গোল্ড বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্রুত মিশরে পৌঁছন। কায়রো ফেরার আগে তিনি কিংস ভ্যালির তুতানখামেনের সমাধিসৌধ দেখে আসেন। কিন্তু তাঁরও মৃত্যু ঘটে কায়রোতে ফিরে এক হোটেলে প্রবল জ্বরে। রেডিওলজিস্ট আর্চিবল্ড রেইড তুতানখামেনের বয়স ও মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে আধুনিকতম এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করেন। পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে তাঁরও মৃত্যু হয়। কারনারভনের ব্যক্তিগত সচিব রিচার্ড বেথেল তুতানখামেন আবিষ্কারের কিছুদিন পর ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ট-অ্যাটাকে মারা যান। তুতানখামেনের সমাধিসৌধ দর্শন করে ফেরার পর ব্রিটিশ শিল্পপতি জোয়েল উলের মৃত্যু হয় রহস্যজনক জ্বরে। এই মৃত্যুর ধারাবাহিকতাকে বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক শার্লক হোমস-এর স্রষ্টা আর্থার কোনাল ডয়েল অভিহিত করেন 'ফারাও-এর অভিশাপ' বলে।

সমাধি আবিষ্কারের ছ'বছরের মধ্যে সার্কোফ্যাগ্যাসেস খোলার সময় উপস্থিত টিমের ১২ জনের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী সাত বছরে মূল খননকার্যে যুক্ত দলের মাত্র দুজন বেঁচে ছিলেন। কারনারভনের সৎ-ভাই সমাধি প্রকোষ্ঠের দেওয়াল চিত্রে অর্ধশায়িত শৃগাল দেবতার ভয়ে উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। এছাড়াও কিংস ভ্যালির তুতানখামেন সমাধির খননকার্যে যুক্ত থাকা ২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু তথ্যও জানা গেছে। একমাত্র মূল নায়ক হাওয়ার্ড কার্টারের বৃদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে। তবে কার্টারের পোষা ক্যানারি পাখিটিকে প্রকোষ্ঠের মমির আশপাশে থাকা একটি গোখরো সাপ গিলে খায়। তবে এই ক্যানারি পাখির মৃত্যু নিয়েও আছে নানা জল্পনা-কল্পনার লতাপাতা।

মিশরের প্রত্নসম্পদ বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯৬৬ সালে তুতানখামেনের প্রত্নসম্পদ প্যারিসে প্রদর্শনে পাঠাতে আপত্তি করেন। কারণ তিনি নাকি স্বপ্নে নির্দেশ পান যদি প্যারিস প্রদর্শনীতে এইসব ফারাও শিল্প সামগ্রী পাঠানো হয় তাহলে ক্ষতি হবে। কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা না শুনে প্যারিসে পাঠান তুতানখামেনের প্রত্নসম্পদ। প্যারিস যাত্রার পরে রাস্তায় বেরিয়ে ইব্রাহিম পথ দুর্ঘটনাতে মারা যান।

১৯৬৯ সালে আবার তুতানখামেনের মমি রহস্যের অভিশাপের কথা উঠে আসে। ১৯২৩ সালের কার্টার টিমের অভিযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র কারনারভনের রক্ষী রিচার্ড অ্যাডামসন বেঁচেছিলেন। তিনি মমির অভিশাপ প্রসঙ্গে টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিদ্রূপ কটাক্ষ করেন। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। তাঁর ছেলে বিমান দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায়। তবু তিনি কটাক্ষ করে অভিশাপ প্রসঙ্গে অবিশ্বাস ব্যক্ত করে দ্বিতীয়বার টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এবারও স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পথদুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত দেহে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় অভিশাপের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশের ভুল স্বীকার করেন বৃদ্ধ রিচার্ড অ্যাডামসন।

এরপর আরেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে ১৯৭২ সালে। সেদিন মহম্মদ ইব্রাহিমের উত্তরসূরি প্রত্নবিভাগের ডিরেক্টর ডঃ গামাল মেহেরেজের হাতে দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিশেষ প্রদর্শনীতে তুতানখামেনের প্রত্ন সামগ্রী পাঠানোর। তাঁর পূর্বতন ডিরেক্টর মহম্মদ ইব্রাহিমের দুর্ঘটনাজনক মৃত্যুকে তিনি নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রদর্শনীতে প্রত্নসামগ্রী প্লেনে তুলে দেওয়ার পরের দিনেই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মেহেরেজের মৃত্যুই শুধু ঘটে না, যে বিমান তুতানখামেনের প্রত্নসামগ্রী বহন করেছিল তার যাত্রীদেরও নানা আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি ঘটনা মমি রহস্যের দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিমানের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার ইয়ান ল্যান্সডাউন লন্ডনে পৌঁছনোর আগে দাম্ভিকতায় মমির মুখোশবহনকারী পেটিকাতে পা দিয়ে মন্তব্য করেন— 'আমি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রীতে পা রাখতে পেরেছি।' ঠিক বিমান থেকে নামার সময় রহস্যজনকভাবে তিনি সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যান। আজীবন তাঁকে খোড়া পা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

এইসব মৃত্যুরহস্যের যবনিকা উন্মোচন করতে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়েছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় তত্ত্ববিষয়ক গবেষক জেনিফার ওয়েগনারের মতে সমাধিসৌধের প্রকোষ্ঠে শুধু মমি নয়, মৃতদেহের সঙ্গে অনেক খাদ্য দ্রব্যও রাখা থাকত আত্মার তৃপ্তির জন্য। মাংস, সবজি প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে শুধু পোকামাকড় নয়, ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের সৃষ্টি হয়ে এক ভয়াবহ মৃত্যুর আবহ সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়া পরীক্ষায় দু-প্রকার ছত্রাকের সন্ধান মিলেছে। হাজার হাজার বছরের খাদ্যসামগ্রী এক বিশেষ ধরণের মারাত্মক বিষমণ্ডের সৃষ্টি করেছিল। তাই তার সংস্পর্শে আসলেই মানুষের মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু প্রশ্ন, যারা এই প্রকোষ্ঠে কখনই ঢোকেনি কিংবা দূরে থেকে 'ফারাও অভিশাপে' প্রাণ দিয়েছিল তাদের মৃত্যুরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

তবে মিশরীয় পদ্ধতিতে সমাধিসৌধ সৃষ্টিতে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিরোধসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া যে অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনস্বীকার্য। বাদুড়-চামচিকার বর্জ্যের ওপর যে ছত্রাক জন্মায় তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো শ্বাসনালীর রোগ হিস্টোপ্লাজামোসিস ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তা হল কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে এক মারাত্মক অজানা জ্বরে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। রোগের সংক্রমণ এমন ভয়াবহ হয়েছিল যাতে চিকিৎসক পর্যন্ত রোগীর সান্নিধ্যে এসে আক্রান্ত হয়। হাসপাতালকর্মীরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। পরে দিল্লির একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসে অনুসন্ধানে জানান শিলিগুড়ির কাছে একটি বাদুড়ের আস্তানা থেকে এই জ্বরের উদ্ভব। তাহলে হাজার বছরের আগেও মিশরের সমাধিসৌধের প্রকোষ্ঠে বাদুড় ও

চামচিকের বর্জ্যের থেকে ভয়াবহ অজানা জ্বরের উৎপত্তি হতে পারে, যার ফলে মশার কামড়ে কারনারভনের মৃত্যু, কিংবা তাঁর বন্ধু গোল্ডের মমি দেখে কায়রোতে ফিরে জ্বরে মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক কারণ হতে পারে। বাকি সব মৃত্যুর কারণের ব্যাখ্যার কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র আজও পাওয়া যায়নি। অস্বাভাবিক আধিভৌতিক সব মৃত্যুকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

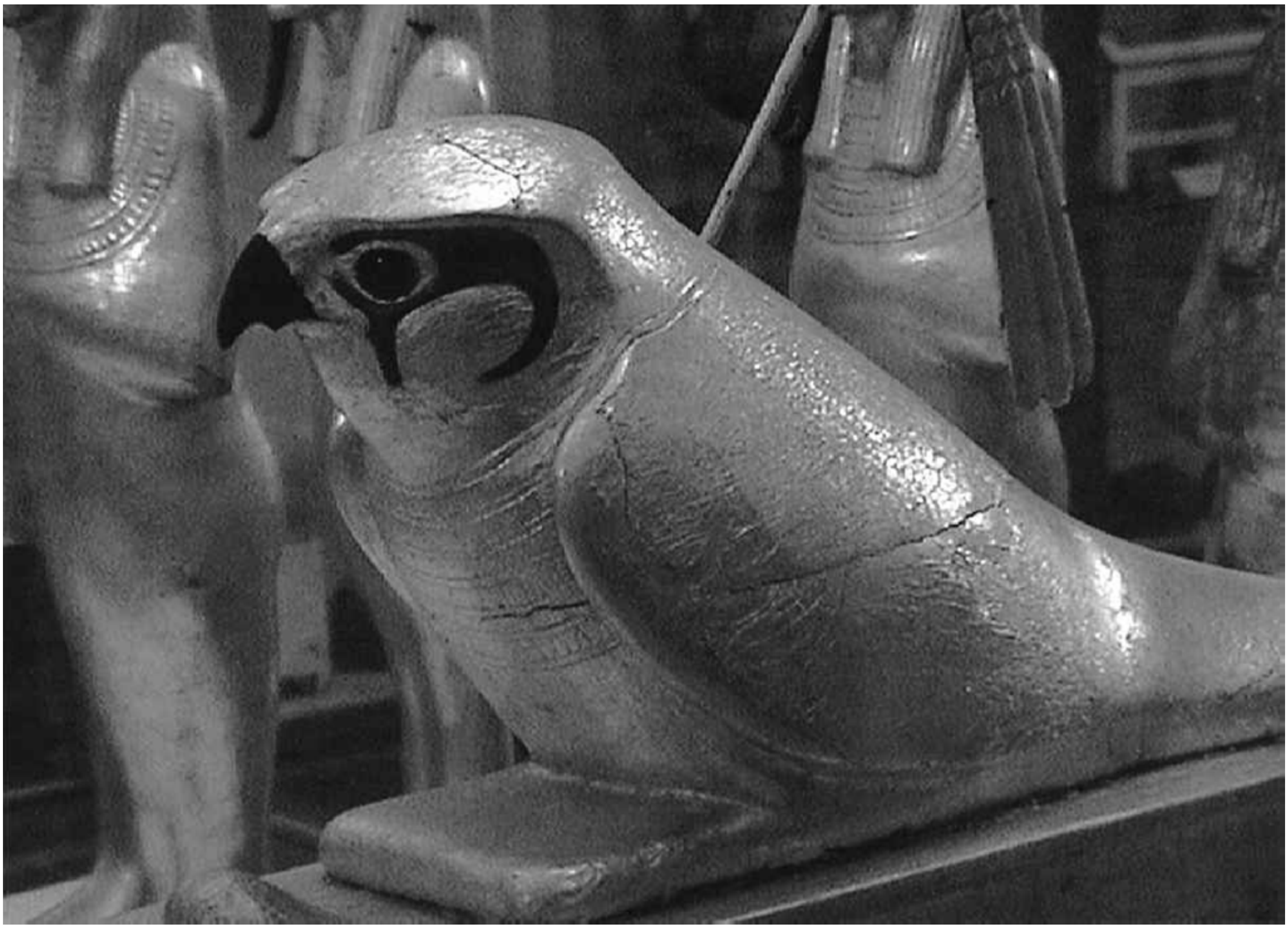
পরিশেষে একটি চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করে তুতানখামেনের মমি রহস্যের মৃত্যুশৃঙ্খলের অমীমাংসিত আলোচনা শেষ করছি। ১৯৪৯ সালে বিজ্ঞানী লুই বুলগারিনির তত্ত্বতে জানান হয়েছিল মিশরের মানুষ পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার জানতেন। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের বেশ কিছু খনি মিশরে ছিল। সোনার সঙ্গে ইউরেনিয়াম মিশিয়ে সমাধিসৌধ নির্মাণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হত। সমাধিসৌধ প্রকোষ্ঠের মেঝেতে ইউরেনিয়ামের প্রলেপ থাকাও অসম্ভব নয়। সমাধিসৌধের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অদৃশ্য মৃত্যুর ফাঁদ বিছিয়ে রাখা সভ্যতার আদিম পর্বে হয়তো ধর্মীয় আচারও হতে পারে। যাতে মমি সুরক্ষিত থাকে এমন এক ধর্মবিশ্বাস, বা সে ব্যাপারে উৎসাহ থাকা প্রাচীন যুগের মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

পুনর্মুদ্রিত এই লেখাটির সঙ্গে ছবিগুলি নতুন সংযোজন



তুতানখামেনের কফিন, কায়রো মিউজিয়াম

তুতানখামেনের সমাধিতে পাওয়া মূর্তি, কায়রো মিউজিয়াম



জ্যান্ত জগৎ

শম্ভু রক্ষিত

আমরা একদিন ছোটমাসির বাড়ি গিয়েছিলাম। আমাদের ছোটমাসির বাড়ি আখড়া। স্টেশনে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা প্ল্যাটফর্মে চলে গেলাম। বাবা দৌড়ে টিকিট কাটতে গেলেন, বালিগঞ্জ থেকে আমাদের আখড়া যাওয়ার টিকিট।

বজবজ যাওয়ার ট্রেন এসে পড়ল, বাবাও টিকিট নিয়ে এসে গেলেন। আমরা মেয়েদের কামরায় উঠে পড়লাম, বাবাও পাশের ছেলেদের কামরায় উঠে পড়লেন।

আখড়া স্টেশন এসে পড়তেই আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে পড়িমরি করে নেমে পড়লাম। বাবা আগেই নেমে দাঁড়িয়েছিলেন।

স্টেশন থেকে ছোটমাসির বাড়ি বেশি দূরে নয়, তাই আমরা হেঁটে চললাম। কিছু পাড়াগাঁ ধরণের জায়গা। দু'ধারে অনেক রকমের পাখি আছে দেখলাম। রাস্তা দিয়ে আনন্দ করতে করতে ছোটমাসির বাড়ি পৌঁছলাম।

ছোটমাসি আমাদের পেয়ে খুব আনন্দে খুশি হতে লাগলেন। অনেক কিছু খাবার এনে খাওয়ালেন। ছোটমাসি আমাদের একদিন থাকতে বললেন, কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। মা বললেন, অন্যদিন এসে থাকব, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা এসে গিয়েছে।

আমরা সেই দিনই সন্ধ্যায় ট্রেনে করে আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম।

আমাদের দেশ সুন্দরবনে। বৃহস্পতিবার, নভেম্বর মাসের শেষ দিন, কাকার মেয়ের বিয়েতে সেখানে গিয়েছিলাম।

বিয়ে ঠিক হয়েছে মসলন্দপুরে। ছেলের বাবা ঘড়ি, সাইকেল, দুই বিঘা জমি আর পাঁচশ টাকা চেয়েছিল। কাকা সব কিছু আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু পাঁচশ টাকা দিয়ে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু পাঁচশ টাকা বিয়ের দিন জোগাড় করতে পারেননি।

বিয়েবাড়িতে অনেক লোক, বর বিয়েতে বসেছেন সেইসময় বরের বাবা আমার কাকার কাছ থেকে পণের বাকি পাঁচশ টাকা চাইলেন। আমার কাকা হাতজোড় করে বললেন, এখনও টাকা জোগাড় করতে পারিনি। বিয়েটা হয়ে যাক, টাকা আপনাকে আমি নিশ্চয় দেব। বরের বাবা শুনলেন না, বর তুলে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমার মদনদাদা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন একধারে তিনি দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখে চলে গেলেন থানায় খবর দিতে। সরকারের লোক মদনদাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। বরের বাবার কোনও কথা না শুনে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন। এদিকে কাকার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ির পিছনে যারা আছে তাদের আমরা খুব অল্পই চিনি জানি। যেমন রাসখেলাওনের গ্রামের ভূটান মুসাহার আর ওই সাঁওতাল লোকটা, আমাদের বাড়ির সামনের বাড়িতে যে কাজ করতে এসেছে, নাম মনে হয় শিবানী মাঝি। আর আছে সেই বুড়ি মাঝে-মধ্যে যে আমাদের গলিতে ছেঁড়া কাগজ কুড়োতে আসে।

আমাদের বাড়িতে একটা টিয়াপাখি ছিল। আমি তার নাম দিয়েছিলাম পুচকান। পুচকান খুব কথা বলতে পারত। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম বলে সে আমায় খুব চিনত।

একবার আমি মামার বাড়ি শ্রীরামপুরে কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম, আমার দিদিকে বলেছিলাম ওকে রোজ খাইয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে শুনলাম পাখিটা মরে গিয়েছে। আমি চলে যাওয়ার পর যে কারুর কাছেই সে খায়নি। আমি এই কথা শুনে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। আমার আনন্দ করার জন্য আমাদের টিয়াপাখি মরে গেল। অনেকদিন দুঃখ থাকল।

আমার ছোট ভাই বেশ বড় হয়ে উঠছে। তার বয়স ছয়। ওর সবকিছু আমাদের মতো। কিন্তু একটি ছাড়া, সে বাঁ হাতি। বাঁ হাতে সে জিনিসপত্র তুলছে, বাঁ পায়ে বল-এ লাথি মারছে, কাগজে আঁকাবুঁকিও করছে বাঁ হাতে। আমরা জানতাম এটি তার জন্মগত গুণ, একে বদলাবার চেষ্টা করলে বদলাতে সে হয়ত পারত। কিন্তু সেটি জবরদস্তি হত।

আমার বড়মাসি একদিন আমাকে এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের চমৎকার গল্প বলেছিল: তোমার স্কুল খুলেছে তবে অন্য কেউ খোলেনি। তুমিও খুলেছ। কোথায় বসবে তোমার স্কুলটা? বাড়িতে, মাঠে, ঝোপেঝাড়ে এবং তোমার আসল স্কুলের শেখার জিনিসগুলো একেবারে নতুন কিছু হবে না। তোমাকে তুমিই পড়াবে, ইচ্ছেমতো জায়গায় ক্লাস বসাবে, কিন্তু আসল শেখাটা হবে এটা-সেটা দেখে, কৌতূহল নিয়ে এটা-সেটা ক'রে। ভারি মজা হবে যে স্কুলে। কখন কী শিখবে তারও কোনও ঠিকানা নেই। আমি বুদ্ধিশুদ্ধি একটু জোগাব।

এই গাছপালা, নদী, মাঠ, জল, জঙ্গল— এসব ছাড়াও এই পৃথিবীতে অদ্ভুত অদ্ভুত আশ্চর্য জিনিস আছে। জায়গা আছে। আছে কত বড় পাহাড়। অরণ্য আছে। হিমবাহ। সে এক আশ্চর্য বিস্ময়। আর এক আছে মজার দেশ। সে আরেক আশ্চর্য। প্রাণী আর উদ্ভিদ উভয়কেই বাতাস নিতে দেখতে হবে। বাতাস নিয়ে কে কী করে সেটাও একদিন দেখতে হবে।



মন-মৌজি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



লেপের নীচে মুখ লুকিয়ে খাচ্ছিল সে গুড়-চা—
সেই না দেখে তাতুই পিসি হঠাৎ গেলেন মূর্ছা!
ডাক্তার নেই, কম্পাউন্ডার বলে উঠলেন: ‘‘দূর-যা—
আদর করে ‘লেপচা’ বলে ডাকলেন ঠাকুরদা।

আরেকজনের কথা বলি, নিতান্তই সে ছোকরা,
দিনরাত্তির নিজের সঙ্গে আড্ডা জমায়, লোকরা
বিরক্ত হয়, কিন্তু দেখি ঠাকুরদা তাঁর ফোকলা
দন্তরাজি মেলে বলেন: ‘‘এই ছেলে বাগ্‌ডোগরা।’’

আরেকজনের কথা বলি, খাচ্ছিল মুড়মুড়কি,
সরেস আতা সঙ্গে ছিল, আর পাটালি গুড় কি?
পাড়ার লোকে বলতে থাকে এ যে দারুণ দুর্দিন—
ঠাকুরদাদা বলেন: ‘‘এ যে কামাল আতাতুর্কী!’’

সত্যি বলতে আমাদের এই ঠাকুরদাদার রাজ্যে
রাজামশাই মন-মৌজি— এতই খুশমেজাজ যে
ঠাকুরদাদার নাকের ডগায় সুরেলা এক দুরবীন

হাতের কাছে মানুষ পেলেই শব্দে সে বদলাচ্ছে!





ছবি: স্বপ্না সেন, চন্দন বৈতালিক, শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শৈবাল ঘোষ, মৃত্তিকা বসু, প্রণবেশ মাইতি, সৌমেন্দ্র আকুলী, নীলোৎপল বিশ্বাস

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর-পত্রিকা ‘পাতাহরপ’-এর পুরনো সংখ্যা থেকে কয়েকটি লেখা বেছে নিয়ে এভাবে প্রতি মাসেই ‘ছেলেবেলা’য় সাজিয়ে দেওয়া হবে।

সম্পাদকের সানন্দ সম্মতিতে ‘পাতাহরপ’ এভাবে কয়েক পাতা করে ফিরে ছাপা সম্ভব হল, এজন্য পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, লেখক, শিল্পী —সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।



গুড়িয়ার বন্ধু জুলি

মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী

চারদিকে পাহাড় আর ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম ডুংরি। ডুংরির পাশ দিয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া পাহাড়ি নদী দিলচু। এ-গ্রামেরই ছোট্ট মেয়ে গুড়িয়া। বয়স বছরদশেক। ওর মা নেই। বাবা দয়াল মা-মরা এই মেয়েটাকে বড্ড ভালোবাসে। যদিও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দয়াল বাড়িতে থাকতে পারে না। সারাদিন পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলে এদিক-সেদিক ঘুরে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে সে। তারপর সেগুলো জড়ো করে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে রাখে। হপ্তাশেষে শনিবারের হাটে সেসব বিক্রি করে আসে দয়াল। তা থেকে সামান্য যা টাকাকড়ি উপার্জন হয়, তাতেই ওদের বাপ-মেয়ের কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়।

গুড়িয়ার প্রিয় বন্ধু জুলি। ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাই বাবা সারাদিন বাড়িতে না থাকলেও গুড়িয়ার একটুও একা লাগে না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সারাক্ষণ ওর পিছে পিছে ঘুরতে থাকে জুলি। গুড়িয়ার সব কথা শোনে ও। খাওয়া-শোয়া কোনওকিছু নিয়েই বায়নাক্কা করে না। বিকেলে গুড়িয়া যখন কাঁখে একটা কলসি আর ছোট একটা বালতি হাতে নিয়ে দিলচুতে জল আনতে যায়, জুলিও



সঙ্গী হয় ওর। সন্ধে নামার আগেই দু'জনে গল্প করতে করতে আবার ফিরে আসে বাসায়। ডুংরির প্রতিটি মানুষ জানে গুড়িয়া আর জুলির এই বন্ধুত্বের কথা।

জুলি একটা ছোট্ট দুষ্টু-মিষ্টি ভালুকছানা। পাঁচ মাস আগে একদিন জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে ফেরার পথে ওকে দেখতে পায় দয়াল। জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় গর্তে পড়ে গিয়েছিল সে।

হয়তো ওর মা সেটা খেয়াল করেনি। এদিকে গর্তের মধ্যে থেকে ছানাটা একা একা উঠেও আসতে পারে না। সে কেবল ছলছল চোখে এদিক-সেদিক খুঁজতে থাকে মাকে। দয়ালের বড় মায়া হয়। সে গর্তের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বাইরে নিয়ে আসে ছানাটাকে। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেয় ওকে। মনে মনে ভাবে, ওর মা ঠিক ওকে খুঁজে নেবে।

জঙ্গলে সন্ধে নামে খুব তাড়াতাড়ি। দিনের আলো কমতে কমতে অন্ধকার হঠাৎই ঘন হয়ে আসে। এ জঙ্গলে হিংস্র পশুপ্রাণীর অভাব নেই। কে কোথা থেকে কখন যে অতর্কিতে হানা দেবে, কেউ তা বলতে পারে না। দয়াল তাড়াতাড়ি পা চালায়। নিজের মনে গুনগুন করে গান ধরে। হঠাৎ ওর মনে হয় কেউ যেন পিছু নিয়েছে। ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। দাঁড়িয়ে পড়ে দয়াল। পিছন ফিরে তাকায় ভয়ে ভয়ে। কিন্তু কাউকেই ও দেখতে পায় না।

পরদিন সকালে গুড়িয়ার ডাকাডাকিতে দয়ালের ঘুম ভাঙে। সে বাইরে এসে দেখে কুয়োপাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুড়িয়া। ওর চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। বাবাকে দেখতে পেয়েই ও ছুটে চলে আসে বাবার কাছে। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে উঠোনের এক কোণে জড়ো করে রাখা শুকনো ডালপালার দিকে। সেদিকে তাকাতেই দয়াল লক্ষ করে সেখানে ডালপালার গাদার ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট ভালুকছানা। গুড়িয়ার চিৎকারে ওরও ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ওর কালো কুচকুচে শরীরে জ্বলজ্বল করছে ছোট ছোট দুটো চোখ। সে মুখ তুলে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে গুড়িয়ার দিকে।

দয়াল তো ছানাটাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। বলে, ও গুড়িয়া, কাল রাতে তোকে যে ভালুকছানাটার কথা বলেছিলাম না— এটা তো সেই ছানাটাই রে! দেখেছিস কেমন গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমার পিছে পিছে বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে!

মুহূর্তেই গুড়িয়ার ভয় কেটে যায়। সে দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নেয় ছানাটাকে। পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় ওর গায়ে। দয়াল ঝটপট উনুন ধরিয়ে একটু দুধ গরম করে। তারপর ছোট একটা বাটিতে খানিকটা ঢেলে ওর মুখের কাছে এগিয়ে দেয়। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে ছানাটা। ধীরে ধীরে গুড়িয়ার আদরযত্নে কিছুটা ধাতস্থ হয় ও। আশ্বস্তও হয় বোধহয়। তাই গুড়িয়া ওর মুখের সামনে দুধের বাটিটা ধরলে একটু থেমে থেমে চুকচুক করে খেয়ে নেয় সবটুকু। দয়াল সস্নেহে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। বলে, মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে ওর তো আর কিছুই খাওয়া হয়নি। বড্ড খিতে-তেষ্টা পেয়েছিল ছানাটার!

সেই থেকে গুড়িয়ার সঙ্গে দারুণ দোস্তি হয়ে গিয়েছে ভালুকছানাটার। গুড়িয়াই আদর করে ওর নাম রেখেছে জুলি। দয়ালেরও কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছে ছোট্ট তুলতুলে ছানাটার ওপর। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ও পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। গুড়িয়াও একদণ্ড কাছছাড়া করে না জুলিকে। আসলে মা-মরা মেয়েটার সঙ্গে মা-হারা ভালুকছানাটার মনের মিলটা যে কোথায়— তা অনুভব করতে পারে দয়াল। তাই মাঝে মাঝে জুলিকে বনে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা মাথায় এলেও তা আর মুখ ফুটে বলতে পারে না।

এভাবে বেশ আনন্দেই কাটছিল দয়াল, গুড়িয়া আর জুলির দিনগুলো। যদিও এ আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। হঠাৎ একদিন সকালে জঙ্গলের রেঞ্জার অফিসারের গাড়ি এসে থামল দয়ালের বাড়ির সামনে। রেঞ্জার অফিসার প্রতাপবাবু গাড়ি থেকে নেমে সোজা এসে দাঁড়ালেন দয়ালের উঠোনে।

দয়াল তখনও কাজে বের হয়নি। প্রতাপবাবুকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে। মান্যও করে। ভারি জাঁদরেল অফিসার তিনি। তাঁর ভয়ে বাঘে-হরিণে একঘাটে জল খায়। তাই প্রতাপবাবুকে এভাবে বাড়ির মধ্যে দেখে দয়াল তো হতভম্ব। অবাক তার প্রতিবেশীরাও। সবাই ভিড় করে দয়ালের বাড়ির বাইরে। ব্যাপারটা জানতে সবাই বেশ কৌতূহলী। এদিকে সম্বিৎ ফিরে পেতেই দয়াল জোড়হাত করে এগিয়ে যায় প্রতাপবাবুর কাছে। সভয়ে বলে, আজ্ঞে, হুজুর আপনি!

প্রতাপবাবুর চোখ ঘুরতে থাকে দয়ালের উঠোনের চারপাশে। গম্ভীরস্বরে বলেন, হ্যাঁ রে দয়াল, তোর বাড়িতে নাকি একটা ভালুকের বাচ্চা আছে? তা পেলি কোথায়, হ্যাঁ?

বাড়িতে অপরিচিত লোকের গলার আওয়াজ শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গুড়িয়া। ওর পিছে পিছে জুলিও এসে দাঁড়ায় উঠোনে। এই কয়েকমাসে জুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। জুলিকে দেখতে পেয়েই প্রতাপবাবুর চোখদুটো রাগে জ্বলতে থাকে। দয়াল কিছু বলার আগেই গর্জে ওঠেন তিনি, ওই তো... ওই তো বাচ্চাটা! হুঁ... ঠিক ইনফর্মেশন ছিল। তারপর দয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেন, তা দয়াল, তোর সাহস তো কম নয়! এতদিন ধরে এ অঞ্চলে আছিস, জঙ্গলের নিয়মকানুন কি তোর জানা নেই? বনের পশুপ্রাণী এভাবে বাড়িতে রাখা যে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ— তা কি জানিস না তুই?

দয়াল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। প্রতাপবাবু কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যান জুলির কাছে। ভালোভাবে পরখ করে বলেন, বাচ্চাটা বড়জোর সাত-আট মাসের হবে! ওকে জঙ্গলে ওর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপর গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজনের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, রামপাল, জলদি ইধার আও। ইস বাচ্চেকো গাড়িমে চড়াও।

গুড়িয়া এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল সবকিছু। কিন্তু রামপাল হঠাৎ করে জুলিকে নিতে এলে ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জুলিকে। তারপর করুণভাবে মিনতি জানায়, তোমরা আমার জুলিকে নিয়ে যেও না। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না! পাশের বাড়ির আমিনাচাচি ছুটে এসে গুড়িয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সান্ত্বনা দেয়।

দয়াল হতবুদ্ধি হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গুড়িয়ার দিকে। পাড়াপড়শিরা সবাই ভয়ে চুপচাপ। প্রতাপবাবুর রুদ্রমূর্তির সামনে কেউ কোনও কথা বলার সাহস পায় না।

প্রতাপবাবু জুলিকে নিয়ে গিয়ে পশুচিকিৎসক বিমলবাবুর হাতে তুলে দিলেন। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি



জানালেন যে, জুলি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ আছে। দু'জনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, চব্বিশঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখার পর ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরদিন সকালে জুলিকে আবার পরীক্ষা করে বিমলবাবু সবুজসংকেত দিলেন। প্রতাপবাবু আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রামপাল সহ তিন-চারজন বনকর্মীর হাতে তিনি জুলিকে তুলে দিলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, জঙ্গলের উত্তর-পূর্বদিকে যেখানে ভালুকদের আস্তানা আছে, সেখানে অতি সাবধানে এই ছানাটাকে রেখে আসতে হবে।

এদিকে দু-দিন প্রায় কেটে গেল। দয়াল কাজে যায়নি; গুড়িয়াও ভাত রাঁধেনি। জলভরা চোখে বাপ-মেয়েতে জুলির শূন্য আসনটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে! তাই পরদিন সকালে গুড়িয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে দয়াল কাজে বের হয়। চাটাইয়ের বেড়ার নড়বড়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরতেই দয়ালের চোখ পড়ে বেড়ার পাশের আকন্দগাছটার ওপর। সে দেখে, গাছটার নীচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে তাদের আদরের জুলি!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না দয়াল। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। দু'চোখ মুছে কাছে গিয়ে সে কোলে তুলে নেয় জুলিকে। উঠোনে এসে চিৎকার করে ডাক দেয়, গুড়িয়া, ও গুড়িয়া, একবার এদিকে আয় মা। এই দ্যাখ জুলি আবার ফিরে এসেছে!

গুড়িয়া ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে— যাই বাবা! উঠোনে এসে গুড়িয়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। জুলিকে এভাবে চোখের সামনে দেখে আনন্দে দু'চোখ ভরে ওঠে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলে, আরে জুলি! তুই কী করে আসলি রে! রেঞ্জারবাবু তোকে ছেড়ে দিল বুঝি? বাঃ, বেশ হয়েছে! তোকে আমি আর কোথাও যেতে দেব না। বলতে বলতে জুলিকে পরমস্নেহে জড়িয়ে ধরে গুড়িয়া। বাড়ি ফিরে আসতে পেরে জুলির মনেও যেন দারুণ আনন্দ। সে গুড়িয়ার ঘাড়ে মাথা রেখে আদর জানায়। খুশিতে ডগমগ হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে গুড়িয়া বলে, আমি বলেছিলাম না বাবা, জুলি ঠিক পথ চিনে বাড়ি ফিরে আসবে।

গুড়িয়ার কথা শুনে দয়াল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। হঠাৎ কী যেন ভেবে এক ঝটকায় জুলিকে কেড়ে নেয় গুড়িয়ার কাছ থেকে। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় গুড়িয়া হতবাক। সে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে বাবার চলে যাওয়া শূন্যপথের দিকে। ওদিকে দয়াল ছুটতে থাকে রেঞ্জারসাহেবের অফিসের দিকে।

ছুটতে ছুটতে দয়ালের কানে বাজে প্রতাপবাবুর গুরুগম্ভীর সাবধানবাণী। জুলিকে সেদিন গাড়িতে তোলার সময় দয়ালের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিলেন, শোন দয়াল, এইবারের মতো তোকে মাপ করে দিলাম। এরপর যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে, সোজা পুলিশে দিয়ে দেব। মনে রাখিস যেন কথাটা!

কথাগুলো মনে পড়তেই দয়ালের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মা-মরা মেয়েটার করুণ মুখচ্ছবি। একমাত্র বাপ ছাড়া ওর যে আপন বলতে এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

ছবি: শান্তনু দে

হাতির পিঠে যাচ্ছে মামা

তরুণকুমার সরখেল

হাতির পিঠে যাচ্ছে মামা
যাচ্ছে মরুভূমি,
যাচ্ছে যখন যাক না, ভেবে
করবেটা কী তুমি?
সঙ্গে আছে ওয়াকিটকি
এবং মাহুত ভোলা,
যাচ্ছে যাক, চিন্তাগুলো
থাক না এখন তোলা।
হতে পারে মামা এবার
আনবে উটের ছানা,
যাচ্ছে যাক, তোমরা বাপু
কেউ কোর না মানা।



ছবি: অবি সরকার

ফাঁকির মজা

সুমন্ত ভট্টাচার্য

স্যার বললেন, ওরে ভুতো
অঙ্কে মোটে তেরো
এবারেও যে টপকালি না
ক্লাস সেভেনের গেরো।
ইংরাজিতে কুড়ির নীচে
বাংলাতে পাস সাতাশ
তুই কি তবে সারাবছর
ফাঁকি দিয়েই কাটাস!

রাত করে তুই রোজই দেখি
কোচিং থেকে ফিরিস,
তবু ক্যান রে ইতিহাসে
টেনেটুনে তিরিশ?
ভুতো এবার বলল— সরি
আছে বহুৎ কারণ,
ফাঁকি দিয়েই পাই যে মজা,
বলা যে তাই বারণ।



ছবি: শান্তনু দে

পাঠকের পাতা

১

নতুন একটি কিশোর পত্রিকার প্রকাশ অবধারিতভাবে মনে রোমাঞ্চ আনে— যখন সত্যিই দেখি স্কুলের পাঠ্য ও প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনার বাইরে পাঠাভ্যাস ক্রমশ কমছে এখনকার ছেলেমেয়েদের। 'ছেলেবেলা' নতুন কিশোরদের সেই বই-বিমুখতাকে দূরে সরিয়ে আমাদের ছেলেবেলাটা তাদের জন্য ফিরিয়ে আনুক।

অঙ্কন রায়, *সাগরিকা কুঞ্জ, বোলপুর, বীরভূম-৭৩১ ২০৪*

২

আর নেই পরোয়া

একটি পঞ্চপদী ছবিতা আঁকলাম—

ঘরে বসে ডাকযোগে 'ছেলেবেলা' হলো চড়োয়া
পড়ে দেখে মনে হলো, ছোটদের খুবই ঘরোয়া
আছে কতো রঙের ছবি
আছে কতো লেখক কবি
নেই কোনো ভাবনা আর, নেই কোনো পরোয়া।

অসিত দত্ত, *অভিজ্ঞান মেমোরিয়াল ছড়া আকাদেমি, শ্রীরামপুর, হুগলি*

৩

'ছেলেবেলা'র জন্য একটা ছড়া পাঠালাম:

রাম-দুবে-সিং

বিখ্যাত বক্সার রাম-দুবে-সিং
দুধওয়ালা পার্কে শেখে বক্সিং
সেইদিন মাঝরাতে ফিরছিল ঘরে
রাস্তায় পুলিশের পড়ে খপ্পরে,
গুঁতো মেরে বলে তাকে চল ব্যাটা থানা—
রামু হয় হতবাক— অহেতুক হানা!
মাঝপথে গিয়ে বলে ছেড়ে দিতে পারি
তবে কিছু ছাড়ো ঘুষ খুব তাড়াতাড়ি,
ঘুষ শুনে রাম-সিং চটে মটে লাল
ঘুষখোরে ছড়াছড়ি— ছিঃ ছিঃ একি হাল!
বলে আমি ঘুষ দেবো এই মুঠো ভরে
এই বলে ঘুষি এক মারলো সজোরে;
ঘুষ নয় ঘুষি খেয়ে দারোগা দাদা
ভ্যাঁ করে কেঁদে বলে ''আমি কী হাঁদা!''।

অয়ন পণ্ডিত, *৫৪/১, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬০*

৪

নতুন সাজে ২০১২ থেকে যে 'ছেলেবেলা' প্রকাশিত হচ্ছে আমি তার নিয়মিত পাঠক। ছোটদের জন্য সবাই ভাবে না। এর জন্য আপনাকে সাধুবাদ। কিন্তু 'ছেলেবেলা' শুধু ছোটদের নয়, আমার মনে হয়েছে বড়রাও বেশ অনুরক্ত হয়ে পড়ছেন। উপরি পাওনা বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন স্বাদের মনোজ্ঞ লেখা। তার ওপর আপনার লেখা আমাদের নেশা ধরিয়ে দেয়। বর্তমান ছেলেরা শৈশব ততটা উপভোগ করতে পারে না, স্কুলের পড়াশোনার চাপে— তার পরিপূরক হিসেবে 'ছেলেবেলা' বেশ কিছুটা পুষিয়ে দিচ্ছে।

স্বরূপরঞ্জন দে, *বারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা*

৫

১৯৮৩ সালের 'ছেলেবেলা'কে দেখিনি। তবে এই 'ছেলেবেলা' বাড়ির ছোটদের জন্য কিনে মন দিয়ে পড়ে ফেলেছি। পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। ছোটদের আনন্দ ও ভালো রাখার প্রয়াসে আপনার যত্নশীল প্রচেষ্টার জন্য আমার ক্ষুদ্র অভিনন্দন নেবেন।

দেবাশিস ঘোষ, *৩/৩, কে রোড, আনন্দপুরী, বারাকপুর-৭০০ ১২২।*

৬

ছেলেবেলা হারিয়ে গিয়ে
পেলাম আবার ফিরে,
স্মৃতিগুলো মাথার মধ্যে
আসছে কেমন ঘিরে!
মনে পড়ে অঙ্ক স্যারের
গাঁট্টাগুলো খাওয়া,
ছুটির দিনে ভরদুপুরে
পুকুর জুড়ে নাওয়া।
পড়ালেখা উঠত শিকেয়
সারাদিন হইচই,
পড়ার কথা বল্লে বলি
হারিয়ে গেছে বই!
হারানো সেই দিনগুলো পাব না আর ফিরে,
'ছেলেবেলা' ফিরিয়ে দিল হাজার স্মৃতির ভিড়ে।

ছড়াটি 'ছেলেবেলা'র জন্য। মে ২০১২ সংখ্যাটি অসাধারণ!

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *মজুমদার মাঠ, মণিরামপুর, বারাকপুর*

৭

'ছেলেবেলা' ছোটদের খুবই উপযোগী পত্রিকা। নামী-গুণীদের লেখা। প্রতিটি লেখা ছোটদের শুধু নয়, বড়দেরও আকর্ষণ করবে। একাধিক ছোটদের পত্রিকা পাই, তার ভেতর এ পত্রিকাটি গুণগতভাবে স্বতন্ত্র এতে কোনও সন্দেহ নেই। পড়ে খুবই ভালো লাগল। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ দেখে আমারও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আমারও জন্ম মায়ানমারের রেঙ্গুন শহরে। এখন বোধহয় এ শহরটার অন্য নাম। তাছাড়া রেঙ্গুন ছাড়া মার্তবান, মোনবিন, থিনানজন ও মালাগন নামক ছোট ছোট শহরে ছিলাম। রেঙ্গুন শহরের ৩৬নং লুইস স্ট্রিটে আমাদের বাসস্থান ছিল। জন্মের পর থেকে ৬-৭ বছর আমরা মায়ানমারে ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে এক ভয়াবহ অবস্থায় ১৯৪১ সালের শুরুতেই সব স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে পূর্ববঙ্গের পিতৃভিটেয় চলে আসা হয়। আপনার পত্রিকার প্রচ্ছদটা দেখে মনে পড়ে গেল তাই উল্লেখ করলাম।

শিবব্রত দেওয়ানজি, *'মধ্যবলয়', ব্লক-২৮, প্লট-৮, নেহরুনগর (পশ্চিম), ভিলাই-৪৯০ ০২০, ছত্তিশগড়*

৮

'ছেলেবেলা' পেয়েই যেন সব ভুলে যাই। ছোট্ট বেলায় ফিরে যাই। 'ছেলেবেলা' মানেই এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো পত্রিকা। প্রথম পাতাতেই একটি ছড়া পড়লাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনামি কবিতা। নাম দিয়েছেন 'আড়চোখে বাঁকা হাসি'। আমার মতে, নামটি হওয়া উচিত 'সদাই হাসি'। আমি 'ছেলেবেলা' পেয়ে দারুণ খুশি।

দেবানন্দ বিশ্বাস, *বলাগড়, হুগলি-৭১২ ৫০১*

পাঠকের পাতা

৯

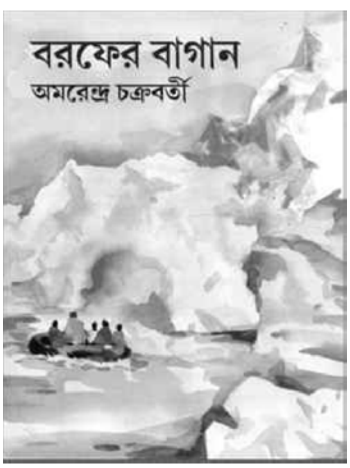
আমার প্রণাম নেবে। আমি 'ছেলেবেলা' পত্রিকার গ্রাহক। দাদু বইমেলাতে তোমাদের স্টলে গিয়েছিল। ৩০ এপ্রিল তোমাদের পাঠানো 'হীরু ডাকাত' এবং 'সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়' সিডি দুটি পেয়েছি। দূরদর্শনে দাদু তোমার ভ্রমণ ছবিগুলি দেখেছে। এই কথা দাদু আমাকে বলেছে। আমি কানে শুনতে পাই না। হিয়ারিং এড ব্যবহার করি। এখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমার ছোট ভাই হেমাঙ্গ ক্লাস টু-তে পড়ে। ও শুনতে পায়। তোমার ভ্রমণ কাহিনী, গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

ভার্গব মজুমদার, *নতুনপল্লি, বোলপুর, বীরভূম*

১০

'এই পৃথিবীর যেখানেই যে খারাপ কিছু করুক
তার ওপরে তারার আগুন ঝরুক।
যে চায় শুধু অন্য লোকের ভালো
সে পায় তারার আলো।'

এই কথাগুলো আমি অনেকবার নানাভাবে বলতে চেয়েছি কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনি। অথচ কবি শমীন্দ্র রাহা কী সুন্দর সহজভাবে বলে দিলেন!



'গৌর যাযাবর' পড়তে পড়তে ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। গৌরের মতো পিছুটানহীন হয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লে মন্দ লাগবে না। গৌরের মতো এমন নির্ভীক, সাহসী, সহজ সরল দেবশিশু বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাক এই বাসনা রাখি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' ও 'চাঁদের পাহাড়' না পড়লে আমার ঘুম আসত না। এখন 'উলিবুরুর জঙ্গলে' পড়তে পড়তে সেই একইরকম স্বাদ অনুভব করছি।

আর 'বরফের বাগান' তো এক কথায় অনবদ্য। এখানে ভ্রমণ কাহিনী ও রূপকথার কাহিনী মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। 'রাজা' যেন রূপকথারই রাজা। শিশু-কিশোরদের মাসিক পত্রিকা হিসেবে এই 'ছেলেবেলা' অচিরেই সব শিশু-পত্রিকাদের ছাড়িয়ে যাবে এই আশা রাখি। এই পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করার জন্য যদি শুভাপ্রসন্ন, যৌগেন চৌধুরীর মতো শিল্পীদের দিয়ে প্রচ্ছদ তৈরি করা যায় তাহলে পাঠকদের কাছে তা বাড়তি পাওনা হবে।

আর সব শেষে একটা কথা বলতে চাই যে, কেবল আজগুবি গল্প ও উপন্যাস আর নামী-দামি লেখকদের লেখা দিয়ে পত্রিকার মূল্য আকাশছোঁয়া করে দিলেই পত্রিকার আভিজাত্য বেড়ে গেল— এটা মনে করে যাঁরা পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তাঁদের এই 'ছেলেবেলা' পত্রিকাটি দেখে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

'ছেলেবেলা' বড়দেরও ছেলেবেলায় ফিরিয়ে আনুক এই কামনা করছি।

ডঃ কল্যাণব্রত সাঁতরা, *সানি পার্ক, ইংলিশবাজার, মালদা-৭৩২ ১০১*

১১

'ছেলেবেলা'র প্রথম সংখ্যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এপ্রিল, মে দুটো সংখ্যাই আমি সংগ্রহ করেছি ও পড়েছি। দুর্দান্ত লেগেছে।

সুজিতকুমার পাত্র, *আজিমগঞ্জ, লোকো কলোনি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১২২*

১২

'ছেলেবেলা'র জন্য একটা ছড়া:

একটু ভেবে বল

মাথায় রে তোর খোলা আকাশ,
সামনে অথৈ মাঠ,
খালি গায়ে চরাস গরু,
বুক শুকিয়ে কাঠ!

বুকটা রে তোর তাতছে শুধু—
কোথায় একটু জল...
আকাশ পানে আছিস চেয়ে—
চোখ দু'টো ছল ছল!

ছল ছল ছল চোখ দু'টো তোর
স্বপ্নে ছিলো ভরা,
স্বপ্ন গেলো ধুয়ে মুছে,
বন্ধ লেখা-পড়া!

লেখা-পড়া রেখে রে তুই
নামলি সবুজ মাঠে!
আকাশ-বাতাস বন্ধু হ'লো,
সুখেই সময় কাটে!

সুখেই কাটুক দুখেই কাটুক,
চোখের কোণায় জল...
বুকের মাঝে কীসের তৃষা—
একটু ভেবে বল!

সাগর দেবনাথ, *রামনগর, সন্ন্যাসীবাগান, রানাঘাট, নদীয়া-৭৪১ ২০১*

১৩

'ছেলেবেলা'র মাসিক দুটি সংখ্যা পাঠ করে প্রভুত আনন্দ পেয়েছি। মে সংখ্যার '৬ নম্বর বাড়ি', 'হাট' কবিতা দুটি অসাধারণ। 'লতিফার চিঠি' পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেলাম। একটা অদম্য টান, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার অন্তরখানি। বরফের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে চমৎকার অনুভূতি হচ্ছে। 'ছেলেবেলা'র লেখাগুলি বড়বেলার আকাশ-ভরা যেন মনোরম নক্ষত্রপুঞ্জ। খুবই যত্ন নিয়ে শুরু করেছেন। আরও অনেক নক্ষত্র বড়বেলার আকাশপানে ছুটবে, এটা নিশ্চিত।

এপ্রিল সংখ্যাটির কেবলমাত্র প্রচ্ছদচিত্রটি আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, মনে হয় এই প্রাচীন পৃথ্বীভূমিতে একটি নিরীহ জীবের পিঠে বসে ওই নিষ্পাপ, পবিত্র শিশুটির মতো আমিও আমার ছেলেবেলার পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছি। ছবিটি অনবদ্য, অসাধারণ, বাঙ্ময়। ভাবিয়েছে। সংখ্যা দুটি তোলা থাকল।

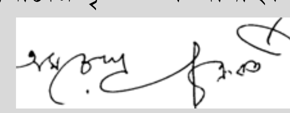
নজরুল হক, *কৃষ্ণনগর, উকিলপাড়া, পি সি বোস লেন, নদীয়া*

উলিবুরুর জঙ্গলে

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ



শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের জন্ম পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবিতে ১৯০৫ সালে। সে-দেশে দীর্ঘকাল কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে চাকরির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ডালহৌসির অফিসপাড়ায় পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসায় চেনা বার্ড কোম্পানির নাম দেখে অফিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। সাহেব তাঁর আফ্রিকা-বাসের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতার কথা শুনে তাঁকে ভারতের উলিবুরুর জঙ্গলে রেললাইন পাতার কাজে নিয়োগ করেন। সেই ভীষণ জঙ্গলে ১৯২৪ থেকে ২৬ সাল ও তার পরের কয়েক বছরে লেখকের ভয়ংকর বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতার এ এক বাস্তব কাহিনী। আফ্রিকার জঙ্গলের পটভূমিকায় লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য কাল্পনিক কাহিনী 'চাঁদের পাহাড়'-এর পাশাপাশি দীর্ঘকাল আফ্রিকাবাসী শ্যামলকৃষ্ণের ভারতের 'উলিবুরুর জঙ্গলে'র বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী সমান আগ্রহে পড়তেই হয়। 'জঙ্গলে জঙ্গলে' নামে প্রথম প্রকাশিত, লেখকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার এই সত্যিকার কাহিনী বহুকাল দুষ্প্রাপ্য থাকার পর 'উলিবুরুর জঙ্গলে' নামে 'ছেলেবেলা'র পাঠকদের জন্য ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। লেখকের পালিতা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জরী ঘোষের সানন্দ সম্মতিতে। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।



আগের কথা

পূর্ব আফ্রিকা থেকে কলকাতায় এসে চাকরির সন্ধান করতে করতে অবশেষে একটি বিদেশি কোম্পানির হয়ে ওড়িশার কেওনঝড়ের গভীর জঙ্গলে এলাকা উলিবুরুতে রেললাইন পাতার চাকরি মিলল লেখকের। মাঝপথ অবধি পৌঁছে ট্রেন আর গেল না। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে রাতটা প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে এক মৃতদেহের পাশে কাটিয়ে সকালবেলা হেঁটেই পৌঁছলেন উলিবুরুতে। হাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত ক্যাম্প থাকার অযোগ্য, তবু তারই মধ্যে জুটে গেল নানা চরিত্র, যেমন ক্যাম্পের ম্যানেজার অ্যালেন, স্টেনোগ্রাফার বোস, সুপারভাইজার জয়গোপাল বক্সির মতো অদ্ভুত মানুষেরা, যারা প্রাণের ভয় আর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এই পাণ্ডববর্জিত বিপদসঙ্কুল জায়গায় পড়ে আছেন। এরই মধ্যে একদিন কেওনঝড়-সিংভূমের গভীর অরণ্যে লাগল দাবানল। চতুর্দিকে চূড়ান্ত সতর্কতা। দাবানলের দরুণ বনের পশুরা দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসছে জঙ্গল ছেড়ে মানুষের বসবাসের সীমানায়।

৬

আমাদের জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। কোনও ঠাকুর নেই, চাকর নেই। কে মরতে আসবে এই জঙ্গলে? সার্ভেয়ার কেশবাবু ছিলেন ওড়িশাবাসী। একবার তিনি লক্ষ্মণ নামে এক পাচককে গড়ের কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনেন। কিন্তু দুদিন না যেতে-যেতেই সে পালিয়ে বাঁচে।

ক্যাম্পের যাবতীয় কাজ আমরা নিজেরাই পালা করে করতাম। চাল ও আলু যোগাড় হত জামদার হাট থেকে। হাট বসতো সপ্তাহে একদিন, বুধবারে। সেদিন কোম্পানির কাজ বন্ধ থাকত, কিন্তু প্রতি হাটে যাওয়া হয়ে উঠত না, কারণ সেই একদিনই সম্বর ও বরাহ শিকারে যেতে হত। ঝুলিয়ে নিয়ে এসে ছাল ছাড়ানো, কাটা ও রান্না করা ছিল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

অবশ্য হাটে চাল ও আলু ছাড়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যেত না।

প্রতিদিন একই পদ— ভাত, আলু ও মাংস। কাজের দিনে পাখির মাংস সহজেই জুটে যেত। বনমোরগগুলো শেষ পর্যন্ত বড় চালাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ময়ূররা ছিল বোকাসোকা, পাওয়াও যেত অজস্র।

একঘেয়ে মাংস চিবুতে চিবুতে বঙ্গ ও ওড়িশা সন্তানদের মনে পড়তো মাছের কথা। আমি অবশ্য মাছের মোটেই ভক্ত ছিলাম না। কিন্তু কয়েকটি মৎস্যপ্রেমিক প্রতিদিন খাওয়ার সময় টেনে আনতেন মাছের প্রসঙ্গ।

একদিন নিছক বাহাদুরির ঝোঁকে বলে বসলাম, 'এ আর এমন কি কথা— আমি খাওয়াতে পারি—'

বোস বললে, 'কেন মিছিমিছি আশা দিচ্ছেন—'

বক্সি কথায় কথায় বাজি ধরতো। বলে বসল, 'বেশ বাজি! এক সপ্তাহের মধ্যে মাছ খাওয়াতে পারলে আমরা প্রত্যেকে দু'টাকা করে দেব। আর না খাওয়াতে পারলে আপনাকে দিতে হবে কুড়ি টাকা 'কমন ফান্ডে'।'

সুকেশ ব্যানার্জি বক্সির পিছনে লাগার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বললে, 'হাণ্ডিয়া ফান্ডে বল!'

থামিয়ে দিয়ে আমি তাকে বললাম, 'এক সপ্তাহ কেন, পরশুই খাওয়াব।'

সুধীর চ্যাটার্জি স্বল্পভাষী লোক। বললে, 'মাছ খাই বা না-খাই খাওয়ার আশা পেয়েছি, তাই বা কম কি? ওইটুকুর মূল্য

হিসেবে তো আমাদের এক টাকা করে চাঁদা দিতে হয়— রসনায় জল এসে গিয়েছে।'

বোস ভাবল রসনা কথাটা খারাপ। আমার মর্যাদা বুঝি হানি হচ্ছে, তাই প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করল সে। বলল, 'বুঝছেন না, ঠাট্টা করছেন উনি। এখানে নদী, পুকুর কোথায়? নালাগুলোতেও মাছ নেই।'

আমি কিন্তু বলে উঠলাম, 'তাহলে বক্সি মশায়ের বাজিটাই পাকা রইল। আমি হারলে বৃহস্পতিবার সকালেই কুড়ি টাকা জমা দেব ঠিকাদার জাগমল দোসার হাতে। সে সাক্‌চি থেকে মিষ্টি আনিয়ে দেবে।'

মিষ্টান্ন ভোজনের সম্ভাবনায় সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি যে বাজি হারছি এ বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চিত।

ঘরে ফিরে বোস বললে, 'খামকা কুড়ি টাকা খরচ করলে আপনার চলবে কী করে? যে টাকা আগাম নিয়ে এসেছেন তার অর্ধেক তো সামনের মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে— তার ওপর আবার কুড়ি—'

ইঙ্গিতে ওকে থামিয়ে দিলাম। ম্যানেজার সাহেবের বেহালার সুর এল ভেসে।

অদ্ভুত এই মানুষটি। এদেশে প্রথম আসে লর্ড কেব্‌ল-এর পরিকল্পিত ইস্পাত কারখানার জরিপের কাজে। ১৯২০ সালের কথা। বর্তমান রাউরকেল্লা কাছাকাছি বিসরা অঞ্চলে ক্যামেললেয়ার্ড ও বার্ড কোম্পানি দশ লক্ষ টাকা খরচ করে কারখানা ও শহরতলির যে নকশা তৈরি করে তার ভার পড়েছিল এই এ্যালেন সাহেব-এর ওপরে। সেই সূত্রে নানারকম কাঁচামালের ইজারা নেওয়ার সময় জরিপের কাজে তাকে পাঠানো হয় জামদা অঞ্চলে।

তারপর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেয়। ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনা মুলতবি থাকে। চেষ্টা চলে ইজারা নেওয়া আকরগুলি থেকে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করে কিছু টাকা তোলার। এ্যালেনকে তখন সেই কাজে ম্যানেজার পদে বহাল করা হয়।

এই রহস্যময় লোকটির ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় কেউ ভালো করে জানতো না। কেন যে সে সুদূর বিদেশে এই দুর্গম পশুসঙ্কুল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কেন যে সে অন্য শ্বেতাঙ্গ লোকেদের সংস্রব এড়িয়ে চলে— এইসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদেরও জানা ছিল না। শুধু এটুকু তাঁরা বুঝেছিলেন— এইরকম একরোখা সৃষ্টিছাড়া লোক না হলে এখানকার ধকল সামলানো অন্য কারও কর্ম নয়।

ম্যানেজারের খাস তাঁবুর মধ্যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ বলেই ভিরতটা দেখার কৌতূহল পেয়ে বসল। একদিন সাহেব ঘোড়ায় চেপে সারাদিনের মতো কোম্পানির পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল এলাকা পরিদর্শনে বার হতেই আমি বোসকে পাঠিয়ে দিলাম সাহেবের খিদমৎগার টিমাকে ভুলিয়ে রাখতে। তারপর নিজে ঢুকলাম তাঁবুতে। দেখি ক্যাম্প-কটের পাতলা বিছানার ওপর বেহালাটি রাখা। চারপাশে একটি ঘোরানো টেবিল। তার ওপর বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, হরেকরকমের কার্তুজ, তিরধনুক, টাকা-পয়সা আর কয়েকটা পুরনো বিলিতি সচিত্র মাসিকপত্র ছড়ানো রয়েছে। পাশে একটা র‍্যাকে কয়েকটা বই, তার নীচে একটা টিনের বাক্স। এছাড়া একগোছা খাকি প্যান্ট-শার্ট, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম এবং কয়েক জোড়া জুতো-মোজা ছাড়া রহস্যজনক কিছু চোখে পড়ল না।

আমাদের মতো দরদি শ্রোতা পেয়ে টিমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার এই অদ্ভুত সাহেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলতো।

সাহেবের এক ভাই নাকি রাত্‌লাম না নীলগিরিতে থাকে। তাছাড়া আর কোথাও কেউ আছে কিনা ও জানে না। সাহেবের যত মনের কথা হয় সব ওই ঘোড়ার সঙ্গে। যত যত্ন ওই পশুকে। দিনের শেষে সাহেব কাজ থেকে ফিরলে পরে টিমা হাজির হয় চা-এর ট্রে আর বিস্কুটের টিন নিয়ে। তারপর স্নানের তাঁবুতে জল, সাবান, তোয়ালে, একপ্রস্থ সাফা প্যান্ট, শার্ট, চটিজোড়া রেখে সে সরে পড়ে। ঘণ্টাখানেক পরে হাঁকডাক শুনে সে সাপার এনে হাজির করে— স্রেফ সুরুয়া, মাংস ও রুটি। নিত্য ওই এক খানা।

সুরার বোতল সাহেব নিজেই খোলেন। ঠান্ডা জলের



ব্যবস্থাও নিজে করেন। ফিল্টার থেকে নারকেল দড়ি মোড়া বোতলে জল ঢেলে ঝুলিয়ে রেখে যান গাছে গাছে। টিমার কাজ সেগুলোকে রোদের সময় ভিজিয়ে রাখা। সন্ধ্যা নাগাদ জল হয়ে থাকে বরফের মতো ঠান্ডা।

পান ও বেহালাবাদন শুরু হয় মেজাজ ও মর্জিমতো। টিমার তখন ছুটি। সাহেব তাঁর নিজের বিছানা নিজেই করে নিতেন। অনেক দিন ভোরে এসে সে উঁকি মেরে দেখেছে বিছানা করাই হয়নি। সাহেব বেহালার কেসটা জড়িয়েই ঘুমিয়ে আছেন— ‘মাগার উস্‌কা মগজ্‌কা আন্দার জরুর একঠো ঘাড়ি হ্যায়’— ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজলেই তড়াং করে উঠে পড়েন— এক মিনিটও এধার-ওধার হয় না।

৭

আমি যন্ত্রপাতি মালমশলার হিসাবরক্ষক হয়ে এসেছিলাম, কিন্তু হয়ে পড়লাম ‘অল-পার্পাস ম্যান’। সাহেব তাঁর অফিস-তাঁবুতে থাকলে যখন-তখন ডাক আসত। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক বিলি করবার দিন বলে ম্যানেজার সকাল সকাল ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়ল। দেখি আমার গোপন সঙ্কল্প ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তাঁবুর এক কোণে উবু হয়ে বসে আছে বুধুন মেট।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সাহেব প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি নাকি আজ রাতে কারো নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছ?’

অপরাধীর দিকে চাইতেই সাহেব বললেন, ‘ও কিছু বলেনি। আমি জেনেছি ওর বাবার কাছ থেকে। খবরদার ওদিকে যাবে না। দুদিন হল একটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে দল ছাড়া। গাঁয়ের পর গাঁ উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। ওর বাবা হচ্ছে সুন্দ্রা গ্রামের মোড়ল। সে আমার কাছে এসেছিল পাগলা হাতিটার খবর দিতে। এখানে এসে ছেলের কাছে শোনে তুমি নাকি এক টাকা বকশিশ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আজ রাতেই ওই পথে যাওয়ার মতলব করেছ— কী এত মাছ খাওয়ার লোভ!’

‘লোভ নয়, বাজি— প্রেস্টিজের প্রশ্ন—’

বদমেজাজি সাহেবের মনে কিসে যে মজার উদ্রেক হত বোঝা ভার। হা হা করে হেসে উঠে বললেন, ‘হাতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তুমি তো এদের ভাষা জানো না— কোথায়, কেমন করে মাছ ধরবে তা জানো?’

বললাম, ‘ইউসুফের কাছে শুনেছি কুন্দ্রাপানি কিংবা কারো নদীর কোন কোন জায়গায় গভীর জলে বড় বড় মাছ থাকে। রাতের অন্ধকারে জলের ধারে ধারে মশাল জ্বালিয়ে ছুটলে মাছগুলো নাকি আলোর টানে ভেসে ওঠে, তখন ওরা তির দিয়ে মেরে ডাঙায় তোলে। এই লোকটার কথা উনিই বলেছিলেন। এ নাকি মাছ মারায় ওস্তাদ। আমাকে দেখিয়েছে সরু সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা তির।’

‘ইউসুফ দেখছি অনেক দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে তোমার মাথায়। তুমি এক টাকা বকশিশ দেবে বলে লোভ দেখিয়েছ। হপ্তাভোর খেটে যাদের আঠারো আনা রোজগার হয় তাদের কাছে এক টাকা হচ্ছে ফরচুন, কাজেই রাজি হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস ওর বাবা এসেছিল! দিনের আলোতে যাওয়াই ফুলহাডি, আবার রাতে— ডোন্ট বি সিলি!’

ঠিক সেই সময় বোস কতকগুলি চিঠি নিয়ে এল সই করাতে। হয়তো কথাবার্তা শুনেও থাকবে। আমি বলে বসলাম, ‘যখন কথা দিয়েছি তখন আমাকে চেষ্টা করতেই হবে।’

কেন জানি না এই রুক্ষ প্রকৃতির পাগলা সাহেব আমাকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখেছিলেন। বোসের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করতে দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, ‘আচ্ছা বেশ! বোস, তোমার অফিস-তাঁবু থেকে এক ইঞ্চি স্কেলের বড় ম্যাপখানা নিয়ে এসো তো।’

এবার বুধুনকে বিদায় দিয়ে নকশা খুলে আমাদের একটি নীল পেনসিলের দাগ দেখালেন। সিংভূমের ২.৪৭ বর্গমাইল ইজারা এলাকা থেকে উত্তর-পশ্চিমে। বললেন, ‘বার্ডের এই ম্যাঙ্গানিজ আকরটার সীমানা জরিপ করতে এসে ওইখানে ক্যাম্প করি। রেল পাতা হবে বলে তখন এদিকে পাথর কাটা হচ্ছে। গাঁয়ের লোকেরা ঠিকাদারকে ধরে সেই সুবাদে পুরনো পুকুরটাকে বাড়িয়ে নেয়। সে বছর বর্ষার পর বাঙালি ঠিকাদার তার মধ্যে কিছু মাছ ছেড়েছিল। শুনেছি সেই ছোট্ট গ্রামে— জাস্ট এ হ্যামলেট— বসন্ত রোগ দেখা দিতে লোকগুলো সব পালায়। তারপর সেই কন্ট্র্যাক্টর অন্য জায়গায় আরও বড় কাজ পেয়ে চলে যায়। এখন আর কুঁড়েঘর কটার হদিস পাবে না, জঙ্গলে গ্রাস করে থাকবে— কিন্তু পুকুরটা নিশ্চয় আছে। সার্ভেয়ারবাবু পথ চেনে। তাকে নিয়ে চলে যাও কাল সকালে— দু-চারটে ডায়নামাইটের স্টিক আর ফিউজ আমি দিয়ে দেব।’

সাহেব নিজের কাজে মন দিতে আমি ম্যাপখানি নিয়ে কেশবাবুর সন্ধানে গেলাম।

বিকেলের দিকে বোস ও কেশবাবুকে ডেকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে স্থির হল, ভোরবেলা চা খেয়েই তিনজনে বেরিয়ে পড়ব।

রাতে তার ছোট প্রাইমাস স্টোভে বোস কিছু আলু-পেঁয়াজের ভাজি বানিয়ে নিল। ম্যানেজার সাহেবের পাচক টিমা হাতেগড়া রুটি বানিয়ে দিল। সেইসব আহার্য বস্তু ও জলের পাত্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলাম বন্দুক, কার্তুজ, বিস্ফোরণের সরঞ্জাম আর টাঙ্গি। বোস তার প্রিয় ছড়িটাও হাতে নিল।

এপ্রিল-মে মাসেও ১,৭০০ ফুট উঁচু জঙ্গলা পাহাড় অঞ্চলে বেলা আটটা-নটা পর্যন্ত কনকনে শীত থাকে। তারপর ক্রমশ রোদ্দুর চড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বন্ধুর পথ দিয়ে চলার পরিশ্রমে সাজসরঞ্জাম হয়ে ওঠে বোঝার মতো।

আমি বুশ শার্টের দুই ঝোলা পকেটে পুরে নিয়েছিলাম বন্দুকের কার্তুজ ও ডায়নামাইট। কাঁধে নিয়েছিলাম কেশবাবুর দুই-নালা বারো বোর বন্দুক। ক্যাম্পের সহকর্মীদের ধারণা আমি যখন পূর্ব আফ্রিকা থেকে এসেছি তখন নিশ্চয় খুব মস্ত শিকারি। অতএব আত্মমর্যাদার খাতিরে আমাকে ক্রুসের মতো বহন করতে হল আত্মরক্ষার যন্ত্রটিকে।

শিকার করার উত্তেজনায় বন্দুকের ভার টেরই পাওয়া যায় না, কিন্তু সেদিন আমরা প্রথম থেকেই স্থির করেছিলাম যে,



একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে বন্দুকের ব্যবহার করব না।

রাতে আহারের সময়ে পিসেমশাই-এর সিংহ, গন্ডার ও হাতি শিকারের শোনা গল্প এমন জমিয়ে করতাম যেন কতই পাশে থেকে প্রত্যক্ষদর্শী। সরাসরি মিথ্যা কথা না বললেও ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য আমার এই বিড়ম্বনা, আমি বন্দুক হাতে কাছাকাছি থাকলে যেন সকলে ভরসা পায়।

কেশবাবু তাঁর অভ্যস্ত হাতে টাঙ্গির আঘাতে ঝোপঝাড় কেটে পথ করে দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ফিউজ আর ডেটনেটর। বোস আহার্য, জল ও তার ছড়িটা নিয়ে পিছন পিছন আসছিল।

দুবার ঝরনার জলের নালা আর ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে আমরা রেলপথের টেলিগ্রাফ পোস্ট দেখতে পেলাম। তারপর লাইন পার হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক শালবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এসে পড়লাম আম-কাঁঠাল গাছের তলায়। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। কেশবাবু বললেন, 'ওই যে টিলার ওপর শিমুলগাছ— তার ওপারেই সেই পুকুরটা। আর মাত্র দু'ফারলং চড়াই উঠলেই হবে, তারপর কিছুটা ঢালু।'

এতক্ষণ অজস্র বনমোরগ, ময়ূর আর হরিণ দেখেছি গাছের ফাঁকে ফাঁকে। পলাশ, কাঞ্চন আর শিমুল ফুলের সৌন্দর্য চোখে পড়েও পড়েনি কারণ ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। কোনওক্রমে গাছতলায় পৌঁছে ছায়াচ্ছন্ন এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম। বোস তার স্বাভাবিক দক্ষতা ও পারিপাট্যের সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলল।

পরিত্যক্ত পুকুরের অবস্থা দেখে আমাদের তো মন খারাপ। দেখি জল শুকিয়ে প্রায় তলায় ঠেকেছে আর পাঁকের ওপর অজস্র বন্যজন্তুর পায়ের দাগ। কেশবাবু বললেন, 'ওর ভেতর মাগুর ছাড়া আর কোনও মাছ মিলবে বলে মনে হয় না!'

আমি বললাম, 'ক্যাটফিশ তো খুব উপাদেয় মাছ। পুকুরের মধ্যে ওই পাথর ব্লাস্ট করলে যা কিছু আছে ভেসে উঠবে। দেখি চেষ্টা করা যাক।'

বিস্ফোরণ হল বিকট শব্দে— পর পর তিনবার। আমরা শিমুলগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে দেখলাম কাদা, জল ও পাথরের ফোয়ারা। তারপর ছুটে গিয়ে দেখি কয়েকটা বড় বড় ব্যাঙ ছাড়া আর কোনও জীব মারা পড়েনি। কেশবাবু তাঁর হাফপ্যান্ট, জুতো, মোজা খুলে হাঁটুজলে নেমে অনেক কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করেও মাগুরের খোঁজ পেলেন না।

ছাপা নকশার ওপর কালি দিয়ে রেলপথ আঁকা মিলিয়ে দেখলাম। ম্যানেজার সাহেব যে এই পুকুরের কথাই বলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ভাবলাম হয়তো বাইসন বা হাতির দলাইমলাইতে মৎস্যকুলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়ে থাকবে। বোসকে প্রশ্ন করলাম, 'আজ কার রাঁধবার পালা হে?'

'বঙ্কিবাবুর—'

বললাম, 'ভালোই হয়েছে— উনি তো মৌতাতের মেজাজে চোখেই দেখেন না। বেশ বড় বড় ব্যাঙের ঠ্যাং কেটে আলুর দমের মধ্যে ফেলে দিলেই হবে। মাছ বলে চলে যাবে—'

আমার উপস্থিতবুদ্ধির ওপর বোসের যথেষ্ট আস্থা ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই উৎকট প্রস্তাবে একেবারে থ হয়ে গেল। কেশবাবু ততক্ষণে তাঁর কর্দমাক্ত অধোবাসটিকে শুকাতে দিয়ে হাফপ্যান্ট ও মোজা পরে উঠে এসেছেন। বললেন, 'তাহলে যে আমাদের খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে— আলুগুলোও বেছে খাওয়ার প্রবৃত্তি হবে না।'

বললাম, 'কেন ফ্রান্সে, চিন দেশে ব্যাঙ তো অতি সুখাদ্য!'

বোসের এবার কথা ফুটল, বললে, 'আমি ও-জিনিস মুখে দিতে পারব না।'

অগত্যা আমাকে পরাজয় স্বীকার করে ফেরার পথ ধরতে হল।

রেলের লাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎ মনে পড়ল জামদা গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও রেল কোম্পানির ঠিকাদার হেম ব্যানার্জি ক্যাম্প ফেলেছেন, তিনি সুকেশবাবুর কে যেন হন। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা, মাথায় এক বিরাট সোলার টুপি। একদিন দেখা হতে তাঁর তাঁবুতে বেড়িয়ে আসতে বলেছিলেন। ভাবলাম ওইরকম প্রফুল্ল মোটাসোটা লোকেদের মনটা দরাজ হয়ে থাকে— হয়তো টিনের বিলিতি মাছ মিলতেও পারে। আমার প্রস্তাব শুনে কেশবাবু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'সে কী? তিনটে বেজে গিয়েছে, ক্যাম্পে ফিরতে রাত হয়ে গেলে মুশকিল হবে, সঙ্গে বাতিও নেই।'

আমি বললাম, 'আমাদের ক্যাম্পটা তো ওদিকেই। সন্ধে হয়ে গেলে ওঁর তাঁবু থেকে একটা মশাল জ্বেলে সঙ্গে নিলেই হবে।'

তখনও সূর্যের আলো প্রখর রয়েছে। বোস আমার মতোই আশাবাদী। বললে, 'তিনি নাও থাকতে পারেন কিন্তু ওঁর চৌকিদার আমাকে চেনে, বাতি নিয়ে এগিয়ে দিতেও পারে।'

কেশবাবুর আর কিছু বলবার রইল না।

ব্যানার্জি সাহেবের ক্যাম্পে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। পৌঁছেই চোখে পড়ল তাঁর পাচক বনমোরগের পালক ছাড়াচ্ছে। বললে, 'এইমাত্র সাহেব চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে হাটের দিকে গেলেন। গাঁয়ের বাইরে এক বাঘ গরু মেরেছে—'

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এতদিন কেবল বাঘের গল্প ও দূর থেকে শব্দই শুনে এসেছি, কিন্তু শিকার করার সুযোগ আসেনি। দেখি বরাতে কী আছে!

কিছু পথ গিয়েই দেখতে পেলাম হেমবাবুকে। ঘিরে কয়েকজন গ্রামবাসী জটলা করছে। সেদিন হাটবার ছিল, কিন্তু দিনের আলো থাকতে থাকতেই দূরের লোকজন তাদের সামান্য পণ্যদ্রব্য হাঁড়িকুড়ি, চুপড়ি, লাউকুমড়ো ও চাল-নুন কেনাবেচা করে চলে যায়। কয়েকটি স্থানীয় লোক হাড়িয়ার কলস ও শিয়াড়িপাতার চোঙা নিয়ে মৌতাত জমিয়ে বসেছিল, এমন সময় নাকি গ্রামে প্রত্যাগত গরুর পাল আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসে। রাখাল দেখতে পায় একটি গাভিকে ঘায়েল করে বিরাট আকৃতির এক বাঘ পথের মাঝে বসেই ভক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। সে-ই ছুটে গিয়ে ঠিকাদার সাহেবকে ডেকে আনে। বর্তমানে ব্যাঘ্রটি গাভির বুক থেকে অনেকখানি রক্তমাংস খেয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। দেখলাম পশুর আংশিক ভুক্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে। শুকনো মাটি সদ্যনিঃসৃত রক্তের অনেকখানি শুষে নিয়েছে।

হেমবাবুর হাতে কিন্তু কোনও বন্দুক দেখলাম না। তিনি আমাদের দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে আসতে আমি সামনের একটি বড় ডালপালাওলা গাছ দেখিয়ে প্রস্তাব করলাম, 'ওর ওপর একটা মাচা বাঁধবার ব্যবস্থা করান, বাঘ নিশ্চয় ফিরে আসবে—'

হেমবাবু বললেন, 'ও আজকের মতো পেট ভরে খেয়ে গিয়েছে। হয়তো বাকিটা সরিয়ে রাখবার জন্য আসতে পারে। আপাতত আড়াল থেকে আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনছে। এখন মাচা বাঁধতে গেলে সাবধান হয়ে যাবে। কাল সকালে যা হোক করা যাবে। এদের বলেছি মরা গরুটার দুটো ঠ্যাং দড়ি দিয়ে ওই কেন্দুগাছের সঙ্গে বেঁধে চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। তাছাড়া মাঝে মাঝে টিন পেটালেই হবে। সব ব্যবস্থা হয়েছে। চলুন, চলুন, অন্ধকার হয়ে এল।'

তিনি আমাদের একরকম টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর তাঁবুতে। আমি ব্যাঘ্র-শিকারে আগ্রহ প্রকাশ করতে হেসে বললেন, 'তা বলে আপনার ওই বারো বোর বন্দুক দিয়ে কোনও বড় জানোয়ার মারবার চেষ্টা করবেন না— বিশেষ করে মাটিতে দাঁড়িয়ে। কাল আবার আসবেন তখন মাচা তৈরি থাকবে।'

আতিথেয়তার জন্য হেমবাবুর সুনাম ছিল। সেকথা বোস পথেই বলেছে। তাঁবুর ভেতর গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে প্রথমে একপর্ব চা খাওয়া হল। ইতিমধ্যে আড়চোখে দেখে নিয়েছি নানা প্রকারের হান্টলিপামার বিস্কুট থেকে শুরু করে হরেকরকম বিলিতি খাদ্যবস্তুর টিনে তাক ভর্তি। মনে আশার সঞ্চার হল। হৃদ্যতা জমে উঠতে একফাঁকে বাজির কথাটি বলে ফেললাম। তিনি সরবে উচ্চ-হাসি হেসে বললেন, 'মশাই, ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগুলোকে খাইয়ে তুষ্ট করা হচ্ছে আমাদের ব্যবসার অপরিহার্য অঙ্গ— সব কিছু মজুদ রাখতে হয়। সুইডিশ সার্ডিন, হেরিং, স্কটিশ সামন এসবের নমুনা আজকের ডিনারের মেনুতেই আছে। খেয়ে দেখবেন এবং সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

বললাম, 'সে কি? আমাদের যে সকাল-সকাল ফিরতে হবে। দেখছেন, ঘোর অন্ধকার হয়ে এল, সঙ্গে কোনও বাতিও আনিনি— একটা যদি মশাল দেন!'

হেমবাবু বললেন, 'পাগল নাকি, আপনাদের যখন পেয়েছি তখন সহজে ছাড়ব ভেবেছেন? মুখ-হাত ধোয়ার সময়েই আমি ডিনারের অর্ডার দিয়ে এসেছি। আপাতত কিছু গান শুনুন, নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। ফেরার জন্য ভাববেন না, সে ব্যবস্থা আমার।'

তারপর তিনি লম্বা চোঙওলা, হাতে দম দেওয়া 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গ্রামোফোন বের করে আনলেন। এ-যন্ত্রটি আমাদের ক্যাম্পে কারও ছিল না। না থাকাটা এক হিসেবে সৌভাগ্যই বলতে হবে— নাহলে একই গান বার বার শুনতে হত আর সে আওয়াজ অরণ্যের স্বাভাবিক ধ্বনিগুলি থেকে আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করত। তাছাড়া ম্যানেজারের বেহালা ও আমাদের যান্ত্রিক গানে যে বিরোধ বাধত তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার মতো গান শুনতে ভালোই লাগল— রামপ্রসাদি, নানা ধরণের কীর্তন আর কয়েকখানা থিয়েটারের গান।

ভূরিভোজন করে খাওয়া সারতে আটটা বেজে গেল। পোলাও, মুরগি, মাছ ও টিনের বিলিতি ফল তো খাওয়ালেনই, সঙ্গে আবার কয়েকটা মাছের টিন দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমার রাইফেলটা রেলের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিয়ে গিয়েছেন শিকার করতে। আপনাদের দু-নলা বন্দুকটা যদি রেখে যান বড় ভালো হয়— যদি বাঘটা আসে, গাঁয়ের লোকেরা ডাকাডাকি করে! আপনাদের আমি একটা ছোট শটগান দিচ্ছি— আত্মরক্ষার পক্ষে এই যথেষ্ট। তবে ব্যবহার করার দরকার হবে না, কারণ আপনাদের সঙ্গে একটা নতুন হ্যারিকেন লণ্ঠন দিচ্ছি। আলো থাকলে জানোয়ার কাছে ঘেঁষবে না।'

তিনি এবার কেশবাবুকে ক্যাম্পে ফেরার সোজা পথটা বুঝিয়ে দিলেন।

কেশবাবু জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ওই পথটা জানেন। দু'বার একটা নালা আর একবার একটা ছোট পাহাড় পার হতে হবে।— 'ওই দিক থেকেই তো আমাদের লোকজনেরা হাটে আসে।'

আমরা হেমবাবুকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

আমি শটগানের মধ্যে একটি বল ভরে, ট্রিগার তুলে আগে আগে চললাম। কেশবাবুর হাতে লণ্ঠন আর টাঙ্গি। বোসের হাতে তার প্রিয় বেতের ছড়ি। অবশ্য ওদের দুজনেরই ভরসা আমার বন্দুক।

রেললাইনের দুদিকে খানিকটা খোলা জায়গা অতিক্রম করবার পর আমরা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলা পথ ধরলাম। কেশবাবু সাবধান করে দিলেন যে, এদিকের গাছপালা খুব ঘন, বিষাক্ত মাকড়সার পুরু জালে আর কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ে ঠাসা। আরও বললেন যে, জানোয়ারেরা নিঝুম রাতে এই পথেই যাতায়াত করে। আজ হাটের জন্য মানুষের চলাচল বেশি তাই এদিকে আসবে বলে মনে হয় না। তবে ভালুককে বিশ্বাস নেই। ওরা খুব খানিকটা মহুয়া খেয়ে ফেললে মাথাগরম বেপরোয়া হয়ে যায়। একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে বন্দুক চালাবার সময় পাওয়া যাবে না। এদিকে অবশ্য কোনও মানুষখেকো বাঘ নেই— তবে এসে পড়তে কতক্ষণ— ওরা কাঁটাঝোপ পছন্দ করে না সেই যা ভরসা, নালার কাছে গেলে নজর রাখতে হবে। যে রকম আগুন লেগেছে ওদিকের পাহাড়গুলোতে, অনেক কিছু জলের খোঁজে মরিয়া হয়ে চলে আসতে পারে এদিকে।'

কেশবাবু সাধারণত কম কথা বলেন। আজ মনে হল পথ সম্বন্ধে সন্দিহান অথবা পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন বলেই অবিরাম বকে যাচ্ছেন। আমার কিন্তু শুকনো পাতার ওপর মড়মড় শব্দে পা ফেলে এগিয়ে যেতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে তাক করে চলছিলাম। বোস কাছাকাছি ছিল। কোনও কথা বলবার সুযোগ পায়নি সে। হঠাৎ ফিসফিস করে বললে, 'কারা যেন দল বেঁধে আসছে।' সার্ভেয়ার নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। এত রাতে হাটের দিনে লোকজনের বিপরীত দিকে যাওয়ার কথা, কিন্তু সামনের দিক থেকে আসে কারা? হয়তো শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে!

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়তে মত্ত কণ্ঠে কথাবার্তা কানে এল। কেশবাবু চুপিচুপি বললেন, 'ওরা কোল!' গাছের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো দেখা যেতেই আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। বোসকে বললাম, 'চট করে হ্যারিকেনের বাতিটার পলতে নামিয়ে দাও। কোলেরা নাকি একজোটে থাকলে বাঘকেও ডরায় না, এই ঝোপের নীচে লুকিয়ে পড়া যাক। দেখি ওদের কেমন সাহস!'

বাতিটার আলো খুব কমিয়ে গাছের পাতায় ঢেকে দিয়ে নিজেরাও লুকিয়ে পড়লাম। দলটা খুব কাছে আসতেই আওয়াজ করলাম— আহাররত বাঘের গলার গরগর ধ্বনি। এ শব্দ ওভারসিয়ার সোয়ারিস আমাকে শিখিয়েছে। সে ছিল পশু-পাখির ধ্বনির অনুকরণে নিপুণ।

আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা টাঙ্গি আমার নাক ঘেঁসে বেরিয়ে গিয়ে পাশের গাছের গুঁড়িতে বিঁধল। বিপদের সঙ্কেতে আমি তৎক্ষণাৎ বন্দুক ফেলে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে উঠলাম। দেখলাম আমার সঙ্গীরাও হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। মশালের আলোতে আমাদের সুস্পষ্ট দেখা গেল। আমরাও দেখলাম দশ-বারোজন লোক টাঙ্গি তুলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাঘ হলেও তার পালাবার কোনও পথ থাকত না। দলপতি হাত তুলে অন্যদের থামিয়ে দিল, যেন টাঙ্গি না ছোঁড়ে। দেখি সে আমাদের কোম্পানির একজন মেট, আমাকে চিনতে পেরেছে। আমাদের মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হওয়ার আগেই সে বলল, 'এভাবে ভয় দেখানো আপনাদের ঠিক হয়নি। আজ হাটের দিন, পেটে হাঁড়িয়া পড়েছে— জানোয়ার ভেবে মেরে বসলে সকলের ফাঁসি হয়ে যেত।'

ওদের দুজনের পিঠে দেখলাম মাদল। আর কথা না বলে জামদার দিকে রওনা দিল। বুঝলাম নাচের তাড়া আছে।

কয়েক মুহূর্ত অপদস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ দেখি অন্ধকার। বোস লণ্ঠনটা তুলে উত্তেজনার মাথায় পলতে বাড়াতে গিয়ে উল্টো ঘুরিয়ে বাতিটা একদম নিবিয়ে ফেলেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখি দেশলাই নেই— মনে পড়ল সেই পুকুরটার পাশে ফেলে এসেছি।

এখন কী করা যায়!

বোস বলল, 'ওদের ডাকা যাক। ওদের মশালের আগুন দিয়ে পলতেটা ধরিয়ে নিই।'

আমার আর ওদের ডাকার ইচ্ছে ছিল না— যা ধমক খেয়েছি! তাছাড়া হয়তো আসতে চাইত না। কেশবাবুকে বললাম, 'ওই তো নালার জলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের পাহাড় তো কাছেই। আপনি কি এইটুকু পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না?

কেশবাবু বললেন, 'নিশ্চয় পারব। ওরা তো ক্যাম্পের নীচের নালার ধার থেকেই এল। তাছাড়া এখন তো আকাশের আলোয় পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।'

আগের মতো আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম, সামনে আমি বন্দুক হাতে, তারপরে কেশবাবু ও সব পিছনে বোস।

ছবি: শান্তনু দে *এরপর আগামী সংখ্যায়*

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়



১
খুললে তাঁবু
মুড়লে লাঠি,
লাঠি বলে, তোর
সাথে হাঁটি।





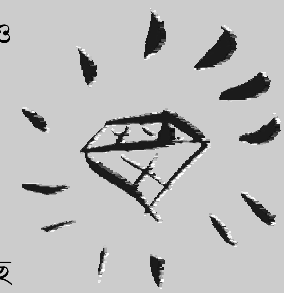


২
শহরে গেলুম একলাএকলি—
ছাড়ে না সঙ্গ! ফের বলে কি না,
যেখানেই যাও— গঞ্জো-বাজার
আমি ছাড়ছি না— আমি ছাড়ছি না—



৩
এক তাঁতিকে দেখেছিলুম
   গোটা দিন তার ঘুমিয়ে কাটে,
রেতের বেলায় জেগেই, সারা
   রাতের মনে বসল তাঁতে।
বসল তাঁতে, বসল তাঁতে,
   রাত কেটে যায় সুতো বুনে—
অবাক হয়ে ভাবছ বুঝি
   এমনধারা কথা শুনে।

৪
সাত রাজার ধন এক মানিক।
রোজ দিন চুরি যায় খানিক।
মাস গেলে দেখি নেই সে কোথাও
কাঁদছে সবাই রাজধানীক:
হায় মানিক! হায় মানিক!
অবাক কাণ্ড! পর দিনে দেখি
টুকি দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ফের।
ওই যে! ওই যে! বেরিয়ে পড়েছে
যে যেখানে আছে চার দিকের:
ওই মানিক! ওই মানিক!
কে লুটেরা আছে রাখবে মজুত
সাত রাজার ধন এক মানিক।



৫
বসে আছে জলে।
মাছ না তা বলে!
দু শিঙ মাথায়
হেলে দুলে যায়।
শিঙ দেখে ভয়?
না, না, মোষ নয়।

উত্তর: (১) ছাতি (বাংলা)। (২) বাতাস (বিলিতি)। (৩) মাকড়সা (বিলিতি)। (৪) চাঁদ (মারাঠি)। (৫) শামুক (বাংলা)।


ফাঁদে পড়ল নাসিরুদ্দিন
ছবি / চিত্রনাট্য
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মোল্লাসাহেব, এ তল্লাটে আপনার মতো জ্ঞানীগুণী মানুষ আর কে আছে বলুন!
না না কী যে বলেন
সে কী? আমি?
তাই বলছিলাম, একদিন যদি আমাদের সকলকে কিঞ্চিৎ নীতিধর্মশিক্ষা দিতেন...!
যথার্থ বলেছেন!
কোনও না শুনব না মোল্লাসাহেব! হৃদয় আকুল হয়ে আছে।
যথার্থ! যথার্থ!
আরে ধুত্তোর! নিকুচি করেছে যথার্থের!
আজ্ঞে সেও যথার্থ!!!
নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা শুনতে ভিড়
মোল্লা নাসিরুদ্দিন জিগ্যেস করলেন...
আচ্ছা, আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সে সম্পর্কে জানা আছে কারও?


সকলেই বলে উঠল
শুনব
জানি না
বলুন
কেউ কিছু জানো না? তাহলে এমন সণ্ডমুর্খদের নীতিশিক্ষা দিয়ে লাভ নেই।
মোল্লা তো আচ্ছা বেকুব বানালো!
আজ্ঞে যথার্থ। তা যা বলেছেন।
দ্বিতীয় দিন আবার মোল্লাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে হাজির করানো হয়েছে। এবার তাঁর প্রশ্নের জবাবে সবাই বলল...
আমরা সবাই জানি
সবাই জানি
জানি
খুব খুশি হলাম। তোমরা সবাই যখন জানো, আমি আর কী শেখাব তোমাদের।
গ্রামের লোকেরা মিলে এবার নতুন ফন্দি আঁটল মোল্লাকে বিপাকে ফেলতে।
শোনো। এবার তোমরা অর্ধেক লোক বলবে, জানি...
যথার্থ। আর বাকি অর্ধেক বলবে জানি না।
তৃতীয় দিন
আজ যে বিষয়ে আলোচনা করব, তার সম্পর্কে কে কে জানো হাত তোল
জানি
জানি না!
বাঃ। এ তো অতি উত্তম কথা। তাহলে তোমরা যারা বিষয়টা জানো, তারা, যারা জানে না, তাদের বুঝিয়ে দাও—
শেষ

হারানো বইয়ের খোঁজে: পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বলো তো?

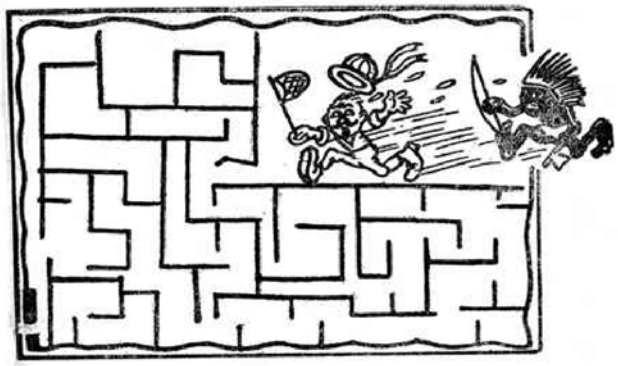
উপেন্দ্রকিশোর গোটা পরিবারটিকেই করে তুলেছিলেন সাহিত্যমুখী। বড়দের কথা ভাবার, লেখার অনেকেই আছেন। তাঁরা ছিলেন একান্তই ছোটদের, ছোটদের নিয়েই যত ভাবনা-চিন্তা। শিশুসাহিত্যে নিবেদিত।

শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠার সুযোগ উপেন্দ্রকিশোরই তাঁদের করে দিয়েছিলেন। নিজে লেখেননি শুধু, ছোটদের জন্য তিনি প্রকাশন সংস্থা খুলেছিলেন, পত্রিকা প্রকাশও করেছিলেন। কত ভালো বই বেরিয়েছে 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' থেকে, 'সন্দেশ'-এ ছাপা লেখা মেঠাই-সন্দেশের থেকেও ছিল ঢের সুস্বাদু। এসব কিছুরই পরিকল্পক উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্র-ভ্রাতা কুলদারঞ্জন-প্রমদারঞ্জনরা তো লিখেইছেন। লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোরের সন্তানসন্ততিরাও। সুকুমার রায়ের লেখা শুধু ছেলেবেলার সঙ্গী নয়, বড়বেলাতেও আমাদের সঙ্গে রয়ে যায়। তখন নতুন করে আবিষ্কৃত হন সুকুমার। উপেন্দ্রকিশোরের অন্যান্য সন্তানসন্ততিদের মধ্যে সুখলতার কথা আমরা অল্পবিস্তর জানি। জানি হয়তো পুণ্যলতাকেও। অকালপ্রয়াতা শান্তিলতা যৎসামান্যই লিখেছেন। সুবিমলও খুব বেশি লেখেননি। সুবিনয়ের লেখার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। নানা ধরণের লেখা লিখেছেন তিনি। গল্প, ছড়া-কবিতা, নাটক ছাড়াও অনেক অনেক বিজ্ঞানের লেখা। ধাঁধা-হেঁয়ালিতেও সুবিনয় অতুলনীয়। 'খেয়াল', 'রকমারি', 'কাড়াকাড়ি' ও 'জীবজগতের আজব কথা'— এ বইগুলি তাঁরই লেখা। সম্পাদনা করেছিলেন 'আজব বই'। 'সন্দেশ' সম্পাদনার জন্যই তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

সুবিনয় রায়চৌধুরী ছোটদের জন্য একেবারে অন্যরকম একটি বই লিখেছিলেন। সে-বইয়ের নাম 'বল তো?'। ধাঁধা-হেঁয়ালির এমন বুদ্ধিদীপ্ত বই সেকালে তো নয়ই, একালেও সেভাবে ভাবা যায় না। আজকের ছোটরা অনেক বেশি চালাকচতুর। তাদের বুদ্ধিকে শাণিত করার জন্য অভিভাবকদের কত না চিন্তা-দুশ্চিন্তা! নানা উদ্যোগ-প্রয়াসেরও শেষ নেই। পারলে ঢকঢক করে বুদ্ধিবৃদ্ধির টনিকই খাওয়ান। হায় রে, এ বইটির কথা তাঁরা যদি জানতেন! এ বই হাতে পেলে একালের ছোটরাও বুদ্ধির রকমারি খেলায় মেতে উঠবে। ঠিকঠাক ধাঁধার উত্তরে, হেঁয়ালির সমাধানে আনন্দে ভরে উঠবে মন। খুশি-আলোয় ঝলমলাবে কচিকাঁচা মুখগুলি।

সুবিনয় রায়চৌধুরীর 'বল তো?' বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে কতরকমের ধাঁধা। চোখের ধাঁধা, ছবির ধাঁধা বা শব্দের ধাঁধা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে অঙ্কের ধাঁধা। ধাঁধার পাশাপাশি হরেক হেঁয়ালি। ধাঁধার উত্তর বা সমস্যার সমাধান না খুঁজে নিজেই যদি চটজলদি মুশকিল-আসান করা যায়, সে আনন্দের তো কোনও তুলনা হয় না। বইটির ভূমিকায় সুবিনয় লিখেছিলেন, 'নানা প্রকারের জ্ঞান ও শিক্ষা ধাঁধা ও হেঁয়ালির মধ্য দিয়া লাভ করা যায়। শব্দের ধাঁধা ভাষাজ্ঞানকে বাড়ায়, শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করে। হেঁয়ালি বুদ্ধিকে খরতর করে ও ভাষাজ্ঞান পরিষ্কার করে।... মোট কথা, ধাঁধা ও হেঁয়ালি বুদ্ধিকে পরিপক্ক করিবার, শব্দজ্ঞান বাড়াইবার ও আমোদের সঙ্গে শিক্ষা দিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।' এ বই থেকে বড়রাও আনন্দের রসদ পেতে পারেন, সেইসঙ্গে শিক্ষালাভও। সুবিনয় স্পষ্ট করেই লিখেছেন, 'বয়সে যাহারা বড়, তাহারাও ইহা হইতে অনেক আমোদ এবং শিক্ষা পাইতে পারে।'

বইটির শুরুতে রয়েছে ধাঁধা-হেঁয়ালির জন্মকথা। কৌতূহল-জাগানিয়া সে পর্ব পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই 'চোখের ধাঁধা'-য়। চিত্রসহযোগে এমন সব ধাঁধা রয়েছে, যা সত্যিই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। 'ছবির ধাঁধা' পর্যায়ে মনে হতেই পারে, এসে পড়েছি এক গোলকধাঁধায়। ছবির পরতে পরতে রয়েছে ধাঁধা-রহস্য। ছবিতে দেখানো এ-পথ সে-পথ ঘুরে শেষে বলে দেওয়া যায়, কীভাবে মৌমাছি পৌঁছবে ফুলের কাছে! কোন পথে পালিয়ে নরখাদকের হাত থেকে সাহেব বাঁচবে, বলে দেওয়া যায় তাও!



শব্দের ধাঁধাও দারুণ মজাদার। 'কলা'কে কীভাবে 'আম' করা যায়, সে-কায়দা একবার জানা হয়ে গেলে অনায়াসে সবাইকে তাক লাগানো যাবে। শব্দ নিয়ে কতরকমের খেলা রয়েছে, তার হিসেবনিকেশ না কষে বরং সমাধানে ব্রতী হওয়া যেতে পারে। শব্দ-খেলা ঠিকঠাক সমাধান করে সশব্দে যত খুশি হাসাও যেতে পারে। না, হাসাহাসিতে মানা নেই। সঙ্গে বন্ধুরা থাকলে, সহজ উত্তর না দিতে পারলে অবশ্য হাসাহাসি করবে।

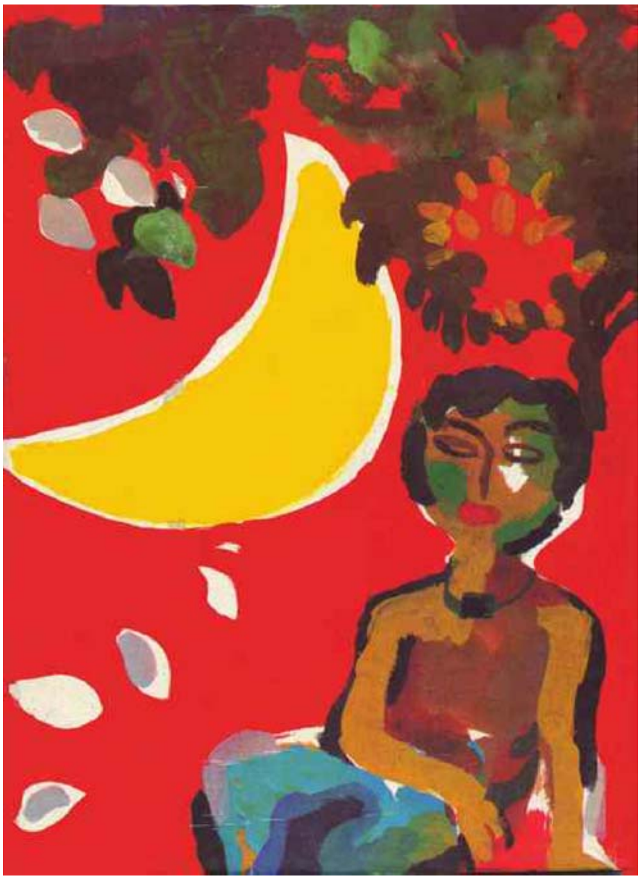
হেঁয়ালি যে এত রকমের, এত ধরণের হতে পারে, সুবিনয়ের বইটি নাড়াচাড়া না করলে অজানা রয়ে যাবে। 'হেঁয়ালি-প্রশ্ন'-গুলিও চমৎকার, দারুণ উপভোগ্য। 'কোন জন্তু বন্দুকে থাকে?'— উত্তরে জানানো হয়েছে 'ঘোড়া'। 'কোন ফলের পেট কাটলে অন্য ফল হয়?'— উত্তরে পাতা উল্টে দেখা যাবে 'কমলা'। 'কোন ফল আর ফুলের এক নাম?' এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেউ হয়তো আকাশ-পাতাল ভাবতে বসবে। শেষে যখন জানবে আর কিছু নয়— 'বেল', তখন না পারলে নিজেকে সত্যিই বোকা মনে হবে। 'এত সহজ, তবু পারলাম না'— ঝরে পড়বে খেদোক্তি। ছন্দোবদ্ধ হেঁয়ালিও রয়েছে অনেক। যেমন, 'বাঁকা মাথা, এক ঠ্যাং, ঢলঢলে জামা গায়—/ঠেলা খেয়ে ফুলে ওঠে— তোমরা কি চেনো তায়?' অনেক ভেবেও যদি উত্তর অধরা রয়ে যায়, শেষে পাতা উল্টে 'ছাতা' জানার পর খুবই পস্তাতে হবে। অঙ্কের প্রতিটি ধাঁধাই বুদ্ধিদীপ্ত। না, অঙ্ক-ধাঁধার ঠিকঠাক সমাধানের জন্য অঙ্কে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। একটু-আধটু অঙ্ক জানা থাকলে, আর প্রয়োজনীয় বুদ্ধিটুকু খরচ করলে ঠিক সমাধান হয়ে যাবে।

সুবিনয় রায়চৌধুরী ভালো হাসির গল্প লিখতেন, সে কথা কেউ কেউ মনে রাখলেও এ বইটির স্থান আজ বিস্মৃতির অতলে। ধাঁধা-হেঁয়ালির যে মডেল তিনি তৈরি করেছিলেন, ছোটদের পত্র-পত্রিকায় আজও তা অনুসরণ করা হয়। অনেক ধাঁধা ও হরেক হেঁয়ালিতে ভরা 'বলো তো?' হাতে পেলে একালের ছোটরাও আনন্দিত-আহ্লাদিত হবে। সুবিনয়ের এ বইটি খুঁজেপেতে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করি।

গৌর যাযাবর

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী



আগের কথা

মা-বাবা হারা গৌর তার মালিক সাহাবাবুদের আশ্রয় ছেড়ে দোলপূর্ণিমার আগের সন্ধেয় পালাল। রাত হয়ে গেলে সে কাছাকাছি গ্রামের কোনও বাড়িতে ঠাঁই নেয়। একদিন ভেসে আসা কান্নার শব্দ শুনে গৌর যে বাড়িটির সামনে থমকে দাঁড়াল, সে বাড়ির বড় ছেলে নবীনকে সাপে কেটেছে। গ্রামবাংলার সংস্কার মেনে ছেলেটির অর্ধমৃত দেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার তোরজোর হচ্ছে। নবীনের আত্মীয়স্বজনের দেওয়া খাবারদাবার ও ছাতা নিয়ে সেই কলার ভেলায় ভেসে পড়ল গৌরও। ধীরে ধীরে রাত নামল। কালো নদীতে ভেলা বেয়ে যাচ্ছে গৌর। এমন সময় হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর, কে যায়? পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব। গলার স্বর দারোগাবাবুর, তিনি তাঁর সহকারীদের নিয়ে ওঁৎ পেতে রয়েছেন ছদ্মবেশ ধরায় ওস্তাদ এক অপরাধীকে পাকড়াবেন বলে। প্রথমে নবীনকে মৃতের ছদ্মবেশে অপরাধী বলে মনে করলেও, পরে ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে দারোগাবাবু ভেলার সওয়ারদের ছেড়ে দিলেন। এদিকে ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙতে গৌর দেখল নবীন চোখ খুলে তাকিয়ে আছে, তার বিপদ কেটে গিয়েছে। বৈদ্যবাটির গঙ্গার ঘাটে সে ভেলা ভেড়ালো। নবীনকে খই-গুড় খাইয়ে সুস্থ করে তুলল। তারপর তার হাতে বাসভাড়ার বিকল্প হিসেবে একটা আস্ত পাটালিগুড় তুলে দিয়ে নিজে এসে দাঁড়াল দিল্লি রোডের মুখে।

৩

গৌর অনেক দূর চলে এসেছে। সূর্যও দিগন্তে স্থির হয়ে বসে আকাশে মাঠে গাছপালায় দিনের শেষ রাঙা রোদ বুলিয়ে দিচ্ছে দেখে সে বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল।



মাঠের ও-মাথায় প্রথমে বাঁশঝাড়, তারপর ঘন বন। গৌর বাঁশঝাড়ের কাছে যেতেই তার মাথার ওপর চামচিকের দল এসে ওড়াওড়ি করতে লাগল। বনের মধ্যে যত দূর চোখ যায়, ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। দূর থেকে একটা গোরুর ডাকও তো শোনা যাচ্ছে না! তাছাড়া, সন্ধে হতে চলল, সামনে গ্রাম থাকলে কোনো বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসত না! গৌর ভাবল, তবে কি লোকালয় ছাড়িয়ে এলাম? দেখাই যাক না।

বনের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে যখন সে ভাবতে শুরু করেছে এবার বোধ হয় ফিরে যাওয়াই উচিত, ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল, একটু দূরে গাছপালায় ঘেরা একটা মাটির বাড়ি।

গৌর বাড়ির পেছন দিকটা দেখতে পেয়েছিল, ঘুরে সামনে গিয়ে দেখল, দরমার তৈরি দরজা বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। তার মানে বাড়ির লোকেরা এখনো ফেরে নি, ফিরবে নিশ্চয়ই!

গৌর দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে গাছে গাছে পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায় নি, হঠাৎ বন কাঁপানো শেয়ালের তীক্ষ্ণ ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। চারদিক অন্ধকার। ভালো করে নজর করে দেখল, দরজা তেমনি বাঁধাই রয়েছে। বাঁধন পরীক্ষা করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে আচমকা গায়ের জোরে তাকে জাপটে ধরেই চেঁচিয়ে উঠল, দাদা, দাদা, দৌড়ে আয়! চোর ধরেছি। আজ একদম শেষ করে ছাড়ব!

— ধরে থাক, ধরে থাক — শক্ত করে ধর — বলতে বলতে বনের দিক থেকে কেউ একজন দৌড়ে এসে গৌরের চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল।

গৌর এতক্ষণে দেখতে পেল, যে ছেলেটা প্রথমে তাকে ধরেছিল সে তার থেকেও দু-এক বছরের ছোটই হবে কিন্তু তার দাদাটার বয়েস প্রায় দ্বিগুণ। ছোটটা এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে বুকের কাছে গেঞ্জিটা খামচে ধরল। তারপর দুজনে মিলে সামনে-পেছনে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেলেটার দাদা চোখ-মুখের বিচ্ছিরি ভঙ্গি করে বলল, কাকের বাসায় ডিম পাড়তে এয়েছ! এবার তোকে বাঁচায় কে গো চাঁদ!

গৌরের চুলের গোড়া টাটাচ্ছে, তবু সে নির্বিকার স্পষ্ট গলায় বলল, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি পালাব না। প্রথমেই আমাকে চোর ভেবে নিলেন দেখে আশ্চর্য লাগছে। আপনাদের মনে বোধহয় সুখ নেই।

দাদার মুঠো আলগা হয়ে গেল, সে ঝপ করে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল, ছেড়ে দে নিধে। চোর নয়, দেখছিস না ভয় পায় নি।

— চোরের চালাকি আমাকে শেখাতে আসিস না দাদা!

গৌর এই সুযোগে নিধের দিকে চেয়ে বলল, গেঞ্জি ছেড়ে দাও, আমি পালাব না। আমি তোমাদের বাড়িতে আজকের রাতটার মতো আশ্রয় নিতে এসেছি।

নিধে ঝাঁঝের সঙ্গে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, দাদা তাকে থামিয়ে গৌরকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের খপর তুমি পেলে কার কাছে? ঘরই বা খুঁজে পেলে কী করে?

— দিল্লি রোড ধরে যাচ্ছিলাম, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি মাঠে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে এই বাড়িটা পেয়ে গেলাম। দরজা বাঁধা দেখে দাওয়ায় বসে বসে তোমাদের অপেক্ষা করছিলাম।

— আজ আমাদের ঘরে চাল নেই।

— আমার সঙ্গে দুমুঠো চিঁড়ে-মুড়ি আছে, রাতটা তিন জনের একরকম চলে যাবে মনে হয়।

নিধে তখনো এক হাতে গৌরের গেঞ্জি ধরে ছিল, তার দাদা এক ঝাপটায় হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, তখন থেকে বলছি ছেলেটা চোর নয়! ফের গায়ে হাত দিলে মারব এক থাবড়া! — তা হ্যাঁগো, তুমি এদিকে যাচ্ছিলে কোথায়? আসছোই বা কোত্থেকে?

— যাবার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়ি।

— মতলব?

— এক জায়গায় আটকে থাকতে ভালো লাগে? তের বছর বয়েস অব্দি কেটেছে বন্দীজীবন। এক গোরুর মায়ায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। আর ছিল একটা বটগাছ। তার যে কী মিঠে ছায়া কী বলব!

নিধের দাদা এবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সেটা ধরাতে ধরাতে হঠাৎ নিধের দিকে ফিরে বলল, নিধে! হাত সামলা বলছি! তখন থেকে দেখছি হুলোর মতো গর গর করছিস! তারপর ধোঁয়া ছেড়ে গৌরের দিকে তাকাল — পুলিশ কি তোমাকে জেলখানার গোয়ালে পুরে দিয়েছিল?

— না, না। আমি সাহাবাবুদের গোরু চরাতাম। আমার বাবাও সাহাবাবুদের বাড়িতে গোরু চরিয়েই স্বগ্যে গেছে।

— এই যে বললে তের বছর অব্দি বন্দীজীবন —

— এক-একটা লোক থাকে না, তাদের কাজই হল তোমাকে অপমান করা! তোমাকে খেতে দেবে, তাও অপমানের ভাত। লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা ছাড়া কথা নেই। সেই লোকের আশ্রয়ে থাকতে হলে সেটা বন্দীজীবন নয়?

বিড়িটায় লম্বা একটা টান দিয়ে নিধের দাদা সেটা টুসকি মেরে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দরজার বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, চলো, চিঁড়ে-মুড়ি কতটা আছে দেখা যাক।

গৌর তার পেছন পেছন যেই না ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, নিধে অমনি চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, দাদা, আজ আমি একে মারব! মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দেব, ভুরু ফাটিয়ে দেব — আমাকে আজ বড্ড মেরেছে — আমি তার শোধ তুলে ছাড়ব!

বলতে বলতে দৌড়ে এসে সে গৌরকে ধরতে যাচ্ছিল, তার দাদা এক লাফে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গৌরকে আগলে রেখে বলল, গায়ে মেখো না ভাই। নিধেটা আজ পাবলিকের হাতে বেদম মার খেয়ে পাগলা হয়ে আছে। তারকেশ্বর লাইনের মার জানো তো? ও আজ মরেই যেত। ভাগ্যিস আমি ধরা পড়ি নি, পাবলিকের একজন সেজে খুব হম্বি-তম্বি করে শেষ পর্যন্ত ওকে সরিয়ে আনি। আমরা ভাই পকেটমার। আয় রে নিধে। মাথা গরম করিস না। ঘরে আয়,



আমি সেঁক দিয়ে দেব।

ঘরে ঢুকে নিধের দাদা হ্যারিকেন জ্বালাল। সেই আলোয় নিধের মুখ দেখে গৌরের বুকখানা মোচড় দিয়ে উঠল। ঈশ, এমনি করেও নাকি মারে! বাঁদিকের ভুরু কেটে রক্ত ঝরে এখন শুকিয়ে গেছে। নীচের ঠোঁট ফাঁক। একটা চোখের নীচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। দেখছে বোধহয় এক চোখে।

নিধে ঘরে ঢুকেই ধপাস করে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে তার একদম অন্যরকম চিৎকার শুরু হল। যেন জবাইয়ের মুরগি। খানিকক্ষণ ওইরকম দাপাদাপি করে তারপর ফুলে-ফুলে সে কী কান্না! নিধের দাদা একটা ময়লা কাঁথা এনে নিধেকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে হাঁড়ির তলাটা কাঁথার ওপর দিয়ে নিধের সারা গায়ে চেপে চেপে ঘষতে লাগল।

নিধে তখনো কাঁদছে দেখে তার দাদা বলল, এত জোরে চ্যাঁচাচ্ছিস, সর্বনাশ একটা না ঘটিয়ে ছাড়বি না দেখছি!

গৌর তার কোঁচড় খুলে বড় একটুকরো পাটালি নিয়ে নিধের মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে তার মুখে দিয়ে নিধের দাদাকে বলল, ঠোঁট থেকে এখনো রক্ত পড়ছে। বাড়ির পাশেই ডোবার ধারে তখন ঢোলকলমীর বন দেখলাম, দৌড়ে গিয়ে একমুঠো পাতা ছিঁড়ে আনুন তো। ঢোলকলমীর রস লাগিয়ে দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্বলন্ত কাঠকয়লার হাঁড়িটা ভাইয়ের গায়ে চেপে ধরে দাদা বলল, দাঁড়াও, আগে গায়ের ব্যথাটা একটু মরক। বড্ড মার খেয়েছে কিনা। মারও খেল, মালকড়িও পেল না — ব্যথার আর দোষ কী! চিঁড়ে-মুড়ির কথা বলছিলে না — তুমি বরং ততক্ষণে, ওই কোণে ওই যে দুটো থালা দেখছ, ওতে ঢেলে ফেল। রান্নাঘরে শালপাতা আছে, আমি শালপাতায় খাব। ভালো পাটালি অনেক দিন জিবে ঠেকাই নি।

গৌর রান্নাঘরে গিয়ে কুঁজোর জল গড়িয়ে হাত ধুয়ে একটা থালায় গুড়-চিঁড়ে মাখল, আরেকটা থালায় মুড়ি ঢালল।

নিধের দাদা ইতিমধ্যে ঢোলকলমীর পাতা নিয়ে এসেছে, গৌর হাতের তালুতে ঘষে রস বের করে নিধের ক্ষতগুলোয় সাবধানে লাগিয়ে দিল।

খেতে বসে তিনজনের কারো মুখেই কথা নেই, শুধু খচর-মচর শব্দ। নিধে হঠাৎ আপন মনে হেসে ফেলে গৌরকে বলল, তোমার তখন লাগে নি তো?

— দূর! আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। তোমরা পকেট মারো কেন?

নিধের দাদা মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, অন্যের পকেট ফাঁক না করলে নিজের পেটের ফাঁক তুমি বোজাবে কী করে শুনি?

হঠাৎ চিবনো বন্ধ করে সে সরু চোখে গৌরের মুখে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, এসব চিঁড়ে-মুড়ি ভিক্ষের জিনিশ নয় তো? আমরা কিন্তু ভিক্ষের অন্ন মুখে তুলি না।

— আমি চুরিও করি না, ভিক্ষেও করি না।

নিধেও মুড়ি চিবনো বন্ধ করেছিল, বলে উঠল, এখন আর গোরুও চরাও না। তাহলে এসব পেলে কী করে?

গৌর হেসে ফেলে বলল, সে অনেক কথা। পরে তোমাদের বলব। আচ্ছা, তোমরা গান জানো?

নিধে এবার মস্ত একমুঠো পাটালিমাখা চিঁড়ে মুখে পুরেছিল, ওই অবস্থায়ই দাদার দিকে চোখ ঠেরে হপহপ করে বলল, ওরে বাবা, আবার!

গৌর কিছু বুঝতে না পেরে হেসে ফেলে বলল, মানে?

নিধের দাদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আমাদের কাছে গান-টানের কথা তুলো না। আমার বাবা ছিল নাম করা কবিয়াল। আমার ছোটবেলায় শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, সিঙ্গুর, হরিপাল থেকে লোকেরা এসে আসরে গাইবার জন্য বায়না করে যেত। বাবা গান বাঁধতও ভালো। তা, তাতে তখন একরকম চলেও যেত। তারপর সব কিছু বদলে যেতে লাগল। ওসব কবিগান-টান কে আর শোনে! আমরাও উপোস করে কাটাতে লাগলুম। দুমুঠো ভাতের অভাবে বাবা মরে গেল। মা মরে গেল। নিধের তখন তিন বছর বয়েস। ও যে কী করে বেঁচে রইল ও-ই জানে।

আপনিও নিশ্চয়ই ছোটবেলায় গাইতেন? আমার মনে একটা চিন্তা আসছে কিনা, তাই বলছি।

নিধের দাদা ঝেঁঝে উঠল — তখন থেকে আপনি-আপনি করে মরছ কেন? — গাইতাম বইকি!

গৌর খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, একটা গেয়ে শোনাও দাদা।

— বলছি না ওসব আমার মনে নেই! সে কি আজকের কথা নাকি! — তুমি তো বেশ ছেলে, এখনো নিজের নামটাই বললে না!

— আমার নাম গৌর। হ্যাঁ দাদা, ঘুমোবার আগে তোমরা শুয়ে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ মনে করো?

নিধের দাদা পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতে বলল, শুয়ে চোখ বুজলেই দেখি পাবলিকের চড়-ঘুঁষিতে নাক-মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে, এর মধ্যে বাপ-মায়ের মুখ আবার ভাবব কখন রে!

দাদাকে বিড়ি বের করতে দেখে নিধে বলল, এবার একটা বিড়ি দে দাদা। আজ যা একখানা রাম ধোলাই হল, বাঁ কানটা ভোঁ-ভোঁ করছে!

সে বিড়ি নিয়ে দরজা ফাঁক করে বেরতে যাচ্ছে দেখে গৌর বলল, কোথায় যাচ্ছ? বসো না। কাজের কথা আছে।

— দাদার সামনে বসে বিড়ি টানব নাকি? বলে সে বাইরে চলে গেল।

নিধের দাদা নিজের বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল, কাজের কথাটা কী?

— পকেট কাটার কাজটা তোমরা ছেড়ে দাও।

— আমরা তো আর তোর পকেট কাটতে যাচ্ছি না। আর কাজটা কিছু খারাপও না। আজ ধরা পড়ে গেছি, কাল ধরা না পড়ে কাজ হাসিল করতে পারলে পেট পুরে গরম গরম মাংস-ভাত খাওয়া ঠেকায় কে রে!

মাংসের কথায় হঠাৎই জিবে জল এসে গিয়েছিল, সড়াৎ করে টেনে নিয়ে আবার বলল, কাল থেকে তুইও বরং আমাদের সঙ্গে চ।

— যাব দাদা, তোমাদের সঙ্গেই যাব। পকেট কাটতে না,



হাটে-বাজারে তোমাদের সঙ্গে গান গাইতে। গান গেয়ে হাট থেকে চাল-ডাল শাক-সবজি কিনে একসঙ্গে ঘরে ফিরব!

— গান গান করে একেবারে হেদিয়ে গেলি। বলছি না গানের কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়!

গৌর এরকম একটা কথা আশাই করে নি, অদ্ভুত একটা কষ্টে তার মুখ কালো হয়ে গেল।

নিধের দাদা হঠাৎ খুব রেগে উঠেছিল, সেটা খেয়াল হতেই কিছুটা নরম গলায় বলল, কাল তাহলে যাচ্ছিস তো? ভয়ের কিছু নেই রে। তোকে আমি দুদিনেই তৈরি করে দেব, দেখিস। কী রে, গৌর?

গৌর উত্তর দিল না।

নিধের দাদা একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, গৌরকে কাল আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয় রে নিধে?

— খুব ভালো হয়! বেড়ে হয় দাদা! গৌর, যাবে তো?

গৌর একথারও কোনো উত্তর দিল না। সে কী একটা চিন্তায় ডুবে আছে।

নিধের দাদা একটা মাদুর পাততে পাততে বলল, গৌরের বুঝি ঘুম পেয়েছে? হ্যাঁরে গৌর, তোর ছুরিটা আমাকে দিবি? ওটা তুই ছাতার মধ্যে রাখিস কেন রে?

গৌর ঘরের মাটিতে চোখ রেখে বসে ছিল। নিধের দাদার কথায় একবার শুধু চোখ তুলে চাইল কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। এমনকী নিধের দাদা যখন আধো ঘুমের মধ্যে জিজ্ঞেস করল, গৌর ঘুমিয়েছিস? — গৌর তখনো চুপ করে শুয়ে রইল, কথার জবাব দিল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দুভাই দেখল, ঘরের দরজা খোলা, গৌর কোথাও নেই। শুধু তাদের মাথার কাছে থালাভরা চিঁড়ে-মুড়ি, খই-পাটালি। আর ঘরের কোনায় তার ছাতাটা, তারমধ্যে তার থালা, গেলাস আর একটা ছুরি।

নিধের দাদা অবাক। ছাতার ভেতর থেকে জিনিশগুলো বের করে ছুরিটার ধার পরখ করতে করতে আপন মনে বলল, অদ্ভুত তো! ছুরিটা শুধু চেয়েছিলাম — এ যে দেখছি সবই রেখে গেছে!

নিধে বাড়ির চারপাশে জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা খোঁজাখুজি করে এসে বলল, একদম হাওয়া! হ্যাঁ রে দাদা, আমাদের কিছু ঝেড়ে দেয় নি তো?

— ঝেড়ে দেবার মতো আমাদের কী আছে রে? ওর নিজের জিনিশই তো ফেলে গেছে! এক কাজ কর, তুই বরং চিঁড়ে-টিরেগুলো মেখে ফেল। আমি ততক্ষণে ডোবা থেকে দুটো ডুব মেরে আসি। তোর ক্ষত এখনো শুকোয় নি, তোকে আজ আর নাইতে হবে না।

খেতে বসে নিধে হঠাৎ কেঁদে ফেলল — দুবেলা চিঁড়ে-মুড়ি চিবোতে কারো ভালো লাগে! দাদা, আমি ভাত খাব। একমুঠো চাল তুই ফুটিয়ে দে। আমি শুধু নুন-লংকা দিয়ে খেয়ে নেব।

— ঘরে চাল আছে নাকি! সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একদানা বেরবে না। চটপট খেয়ে নে, তারপর চ আজ একটু সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়ি। তেমন মক্কেল জুটে গেলে ওবেলা তোকে মাংস-ভাত খাওয়াব— মা কালীর দিব্যি!

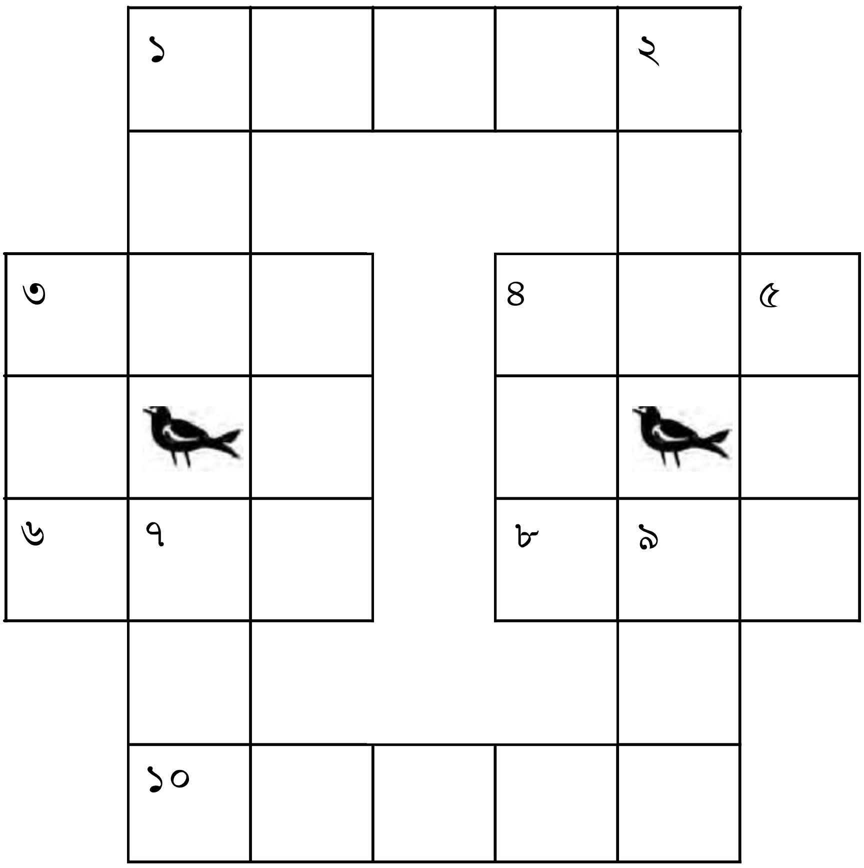
দুভাই চুল আঁচড়ে, যতটা পারল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রোজকার মতো দরজা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। বন পেরিয়ে, বাঁশঝাড় পেরিয়ে, মাঠ ভেঙে বড় রাস্তায় পড়ে তারা রেলের ইস্টিশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

ছবি: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

এরপর আগামী সংখ্যায়

শব্দফাঁদ

অশোক চক্রবর্তী



পাশাপাশি

১। বাংলার এক পরিচিত পাখি
৩। বাতাস, রোদ, ওষুধ ইত্যাদি খাওয়া
৫। একধরণের ফুটবল
৭। সঙ্গীতের এক রাগ
৯। উন্নতি
১১। কার্য-কারণ সম্পর্কহীন দুটি ঘটনা পর-পর ঘটলে

ওপর-নীচ

১। গজল রচনায় বিখ্যাত
২। গণ্ডারের শিং
৩। সৈন্য
৪। প্রবীণের উল্টো
৫। রাবণের জাত
৬। বিশেষ বাড়
৮। সুযোগ
১০। মাটির তৈরি

গত সংখ্যার উত্তর

অ	জা	ত	শ	ক্র		
জ		লো				
গ	ড়ি	য়া		তা		অ
র		র	জ	ত	শু	ভ্র
						খ
		চো	খ	রা	ঙা	নি

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতা

তোমাদের কাছ থেকে প্রচুর সমাধান করা 'শব্দফাঁদ' আমাদের দপ্তরে এসেছে। সবাইকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এ সংখ্যার নির্ভুল উত্তরদাতা: রঞ্জিতা পাল, কৌশিক দাশগুপ্ত, রেশমা খাতুন, অজন্তা ঘোষ, মানিক ভট্টাচার্য, দীপেন চক্রবর্তী, অরিজিৎ মজুমদার, সিদ্ধার্থ সিনহা, সোমা সেন, অর্পিতা মণ্ডল, নাসির আহমেদ, ওয়েন্দ্রিলা দত্ত, মহুয়া ঘোষ, অর্ণব সেনগুপ্ত ও মৌমিতা পাল।

উত্তর পাঠানোর নিয়ম

আলাদা কাগজে শব্দফাঁদের ছক কপি করে সমাধান চটপট পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে।
উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ১৮ জুন। উত্তর পাঠাবে এই ঠিকানায়:
'শব্দফাঁদ', ছেলেবেলা, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

যারা সঠিক উত্তর দেবে তাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়

কথামালা যুগে যুগে

সুনির্মল চক্রবর্তী

যিশুর জন্মের আনুমানিক ছ'শো কুড়ি বছর আগে গ্রিস দেশের ফ্রিজিয়ায় এক পণ্ডিত জন্মেছিলেন। তাঁর নাম ঈশপ। তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার কথা লোকমুখে সারা গ্রিস দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমুখে প্রচলিত তাঁর গল্প অনেক পরে সংগ্রহ করে ব্যাবেরিয়াস গ্রিক ভাষায় পদ্যে লেখেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় ঈশপের গল্প প্রকাশিত হয় তারও অনেক পরে।

বিদ্যাসাগর ঈশপের প্রায় আড়াইশো গল্পের মধ্যে থেকে মাত্র ৮৫টি গল্পের অনুবাদ করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে 'কথামালা' নাম দিয়ে তা প্রকাশও করেন।

'কথামালা' অনুবাদ গ্রন্থ হলেও, তা মৌলিক গল্পের মতোই মনে হয়েছে। সেকালের শিশুদের কাছে তা ছিল স্বাদু, সুখপাঠ্য এবং আনন্দদায়ক।

একালের শিশুদের কথা চিন্তা করে গল্পগুলি নতুন ভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি।

গাধার বোঝা ঘোড়ার ঘাড়ে



এক ছিল ঘোড়া আর এক ছিল গাধা। দুজনেই একটা লোকের ফাইফরমাস খাটত। লোকটা যখন হাটে যেত নিজে চাপত ঘোড়ার পিঠে। সব জিনিস চাপিয়ে দিত গাধার পিঠে। এইভাবে কয়েক বছর কাটল।

দিনে দিনে গাধা বুড়ো হল। মাল বইতে পারছিল না। হাঁপিয়ে উঠত।

একদিন গাধা কাতর হয়ে ঘোড়াকে বলল, তুমি যদি আমার কিছুটা ভাগ নাও, তবে বাঁচব, নইলে আমাকে মরতে হবে।

ঘোড়া বলল, এসব আমাকে বলছ কেন? তোমার বোঝা আমি বইব কেন?

গাধা চুপ করে গেল। কিছু পরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়তেই মারা গেল।

লোকটা তখন আর কী করে। গাধার সব বোঝা চাপাল ঘোড়ার পিঠে। এমনকি মরা গাধাকেও চাপিয়ে দিল।

ঘোড়ার খুব দুঃখ হল। নিজের মনেই বলল, আমার খারাপ স্বভাবের জন্যই এই ফল পেলাম। গাধার কথা শুনলে আমর এমনটি হত না।



চালাকির শাস্তি



এক ব্যাপারী নুনের ব্যবসা করত। একদিন তার কাছে খবর এল এক জায়গায় সস্তায় নুন বিক্রি হচ্ছে। অমনি সে সেখানে গেল। কয়েক বস্তা নুন কিনে ষাঁড়ের পিঠে চাপাল।

এবারে সে অনেক বেশি নুন কিনেছিল। বস্তার ভারে ষাঁড় খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

পথের ধারে ছিল এক নালা। নালাভরা জল ছিল। নালার ওপর এক সাঁকো ছিল। সাঁকোর ওপর দিয়ে সবাই যাওয়া-আসা করত।

ষাঁড় ইচ্ছে করে ওই সাঁকো পেরোবার সময় নালায় পড়ে গেল। নালায় পড়ে যাওয়াতে অনেকখানি নুন গলে গেল। ষাঁড়ের ভার কমাতে, সে আরামে চলতে লাগল।

কিছুদিন পরে ওই ব্যাপারী খোঁজ পেয়ে আবার গেল নুন কিনতে। সেদিনও কয়েকবস্তা নুন ষাঁড়ের পিঠে চাপাল। ষাঁড় এবারেও নানা পেরোতে গিয়ে নালায় পড়ে গেল। ব্যাপারীর খুব ক্ষতি হল।

ব্যাপারী সব বুঝল। এসব যে ষাঁড় ইচ্ছে করেই করছে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ষাঁড়কে উচিত শিক্ষা না দিলেই নয়।

কিছুদিন পরে ব্যাপারী গেল তুলো কিনতে। এবারে কয়েক বস্তা তুলো কিনে ষাঁড়ের পিঠে চাপাল।

ষাঁড় এবারেও নালায় পড়ে গেল। আগে নুন গলে যাওয়ার ভয়ে ব্যাপারী ষাঁড়কে তাড়াতাড়ি নালা থেকে ওঠাত। এবারে সে ইচ্ছে করেই অনেক দেরি করে নালা থেকে ষাঁড়কে ওঠাল।

ভালোমতো জলে ভিজে তুলো খুব ভারী হল। এবারে ব্যাপারী ভিজে তুলোর বস্তা চাপাল ষাঁড়ের পিঠে। তারপর হেঁটে চলল।

নালায় পড়ার আগে যে ভার ছিল এবার তা দ্বিগুণ হল। চালাকির শাস্তি এবারে হাড়ে হাড়ে টের পেল ষাঁড়।

ছবি: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

CHHELEBELA □ Vol 1 □ No. 8 □ 6 June 2012 □ Rs.10 R.N. 42049/83 □ Postal Registration No. KOL RMS/440/2012-2014